দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

সম্ভবামি যুগে যুগে
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব
— পৃঃ ৩৫

কারাগারেই যখন
কৃষ্ণ আগলে রাখেন
— পৃঃ ২৭

৭৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ২৬ আগস্ট, ২০২৪।। ৯ ভাদ্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১ সংখ্যা, ৯ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৬ আগস্ট - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

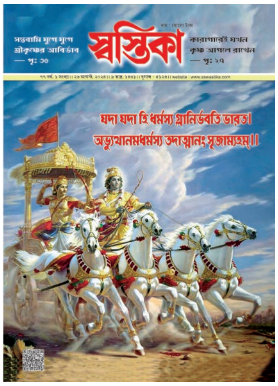

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘কতটা নীচে নামলে তবে মমতা হওয়া যায়’ পতাকা ছাড় মশাল ধর ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

খেলার মাঠে দিদি বড্ড ‘একা’ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনায় ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজন বিচারবিভাগীয় সংস্কার ◻ আশিস রাই ◻ ৮

শক্তিশালী হচ্ছে ভারতের নৌবহর ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

অবনত ভারত চাহে তোমারে এসো সুদর্শনধারী ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠি ◻ ১১

দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে স্বদেশের পরবাসী হয়ে দেশ হারানোর সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে ◻ স্বপন কুমার মণ্ডল ◻ ১৩

মা-বোনেরা কি আদৌ সুরক্ষিত আজকের পশ্চিমবঙ্গে? ◻ দিগন্ত চক্রবর্তী ◻ ১৫

পোষা কালসাপের সহস্র ছোবলে দেশান্তরি হাসিনা, যন্ত্রণায় কাতর বাংলাদেশ ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১৭

‘কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্’ ◻ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী ◻ ১৯

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২১

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীধারাঠাকুরানি ◻ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ২৩

অবতার শৈশবেও শক্তিশালী ◻ দেবজিৎ সরকার ◻ ২৪

দেশবিদেশের ডাকটিকিটে শ্রীকৃষ্ণ ◻ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ◻ ২৫

জন্মাষ্টমীর ছাপ্পান্ন ভোগ ◻ দিতি ভট্টাচার্য ◻ ২৬

কারাগারেই যখন কৃষ্ণ আগলে রাখেন ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৭

নিত্য বৃন্দাবনে আজও সেই কৃষ্ণলীলা ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

সম্ভবামি যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিই জন্মাষ্টমী ◻ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৮

সীতামাতার জন্মস্থান, পশুপতিনাথ এবং গুহ্যেশ্বরীর মন্দির দর্শন ◻ ওমপ্রকাশ ঘোষ রায় ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯**

স্বস্তিকা তার যাত্রাপথের ৭৬তম বর্ষ অতিক্রম করে এই সংখ্যা থেকে ৭৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই শুভলগ্নে স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

বাংলাদেশে হিন্দুরা কতখানি সুরক্ষিত

পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশের হিন্দুরা বিশ্বে ভূমিহীন জাতি হিসেবে পরিচিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেও তারা নিজভূমে পরবাসী। বিগত বহু দশক ধরে অত্যাচারে-নিপীড়নে তারা জর্জরিত। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়ে দেওয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেলেও এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তারা। সমগ্র বিশ্ব তাদের এই প্রতিরোধী মানসিকতাকে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন ধর্মানন্দ দেব, প্রকাশ দাস, সাধন পাল, প্রবীর ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

'ভয়-ভীত জনে করো হে নিঃশঙ্ক'

আসুরিক শক্তির অত্যাচারে মানবতা যখন লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়, তখন তিনি আবির্ভূত হন। তিনি স্বয়ং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, অধর্মের বৃদ্ধি হইলে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হইবেন। দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হইবার পর হইতেই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। শিশুকালেই শত্রুসংহার করিয়াছেন নিতান্তই ক্রীড়াচ্ছলে। বধ করিয়াছেন পুতনা রাক্ষসী-সহ শকটাসুর, তৃণাবর্ত, বৎসাসুর, ধেনুকাসুর, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি কত না রাক্ষসকে। তাহাও আবার তাঁহার বালক-কিশোর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে লইয়া। ক্রীড়াচ্ছলেই বধ করিয়াছেন অধর্মের প্রতিমূর্তি স্বীয় মাতুল কংসকে। বালক বয়সেই অশুভ শক্তি নাশ করিয়া মথুরা-বৃন্দাবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বাল্যকাল শুধুমাত্র সংঘর্ষেই অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি তথায় প্রেমের বৃন্দাবনও রচনা করিয়াছেন। কত যোগী ঋষি সারাজীবন কঠোর সাধনা করিয়াও যাঁহার নাগাল পান না, সেইখানে শুধুমাত্র প্রেমের মাধ্যমে ব্রজবাসীগণ তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া পাইয়াছেন। ব্রজবাসীগণ তাঁহাকে বীরভাব ও প্রেমভাব— দুইভাবেই লাভ করিয়াছেন। তিনি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। যৌবনকাল তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে। তাহার জন্যও তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। যাঁহারা ধার্মিক ও বীর, তাহাদিগের পার্শ্বে তিনি থাকিয়া সহায়তা করিয়াছেন।

বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য যে, তাহারা ধর্মরাজ্য সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণের বীরভাবকে উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র প্রেমভাবে বিগলিত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে তাহাতে বিকৃতি আসিয়া বাঙ্গালি ক্লীবত্বে পর্যবসিত হইল। একদা সক্রিয় ভক্তির অধিকারী বাঙ্গালি নিষ্ক্রিয় ভক্তিতে ডুবিয়া রহিল। সম্মুখে স্বজাতির নিধন দেখিয়া, মাতা-ভগিনীর লাঞ্ছনা দেখিয়া, দেবালয় চূর্ণ হইতে দেখিয়াও তাহারা নিশ্চুপ রহিল। জাতিকে উজ্জীবিত করিবার মহাগ্রন্থ গীতার বাণী বাঙ্গালি হৃদয়ঙ্গম করিল না। গীতাগ্রন্থকে পূজার স্থলে রাখিয়া ফুল-বেলপত্র নিবেদন করিয়া অথবা মৃতের বক্ষোপরি রাখিয়া দায় সারিয়া ফেলিল। দৈনন্দিন জীবনে গীতাপাঠের অভ্যাস থাকিলে বাঙ্গালি দেখিত, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ বীর অর্জুনকে বলিতেছেন, পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার শোভা পায় না। হে বীর, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থিত হও। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বহু গবেষণা করিয়া অবশেষে বাঙ্গালিকে বলিয়াছেন, ভারতীয় সমাজের আদর্শ নায়ক হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার চরিত্রে যে সমস্ত অতি কিংবা আদিরসাত্মক কাহিনির বর্ণনা আরোপিত হইয়াছে তাহা মূল শাস্ত্রগ্রন্থে কোথাও নাই, তাহা পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত মাত্র।

সুখের বিষয় যে, মন্থরগতিতে হইলেও বাঙ্গালির শ্রীকৃষ্ণের বীররসে সিঞ্চিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি মুখর হইয়া উঠিতেছে। মাতা-ভগিনীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সন্দেশখালি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালি প্রতিবাদ সংগঠিত করিয়াছে। সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের যৌননির্যাতন ও হত্যার বিচার চাহিয়া বাঙ্গালি, বিশেষ করিয়া মাতৃজাতি পথে নামিয়া প্রতিবাদে মুখর হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দু প্রকৃতার্থেই শ্রীকৃষ্ণের বীররসে উদ্দীপিত হইয়াছেন। স্বাধীনতার পূর্ব হইতেই তাঁহারা নির্যাতন এবং মাতা-ভগিনীর সম্ভ্রমহানির শিকার হইয়াছেন। এই প্রথম তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিবাদে শামিল হইলেন। বিগত বৎসরগুলিতে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই লক্ষাধিক হিন্দু তাহাদের শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতার্থেই অন্যায়, অবিচার ও দুঃশাসন প্রতিরোধের মূর্তিমান প্রতিমূর্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিতে বাঙ্গালি হিন্দু যেন বীরভাবে উদ্দীপিত হইয়া দুঃশাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইতে পারেন— জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

সুভাষিতম্

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।। (শ্রীগীতা- ১৮। ৭৮)

যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব ধনুর্ধারী অর্জুন, সেখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি এবং অচল নীতি বিদ্যমান – এই আমার মত।

‘কতটা নীচে নামলে তবে মমতা হওয়া যায়’

পতাকা ছাড় মশাল ধর

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

নোবেলজয়ী বব ডিলানকে অনুসরণ করে বলা যায়, ‘কতটা নীচে নামলে তবে মমতা হওয়া যায়’। আর.জি. কর নরককাণ্ডের দ্বিতীয় কিস্তি লিখছি। কোনো আইন বা রাজনৈতিক শক্তি কোনো চিন্তাভাবনাকে আটকাতে পারে না। স্বপ্নের উপর গুলি চালানো যায় না। প্রধানভাবে তার লক্ষ্য যখন ‘ন্যায়’। আর.জি. কর হাসপাতালে মনুষ্যরূপী পশুদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া ‘আমার কন্যা’র কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পুত্র বা কন্যা আমার নেই। কিন্তু অনেক পুত্র আর কন্যাসমা আছেন। সে তাদেরই একজন। পশুদের থেকে তাকে রক্ষা করতে পারিনি। তবে ওই পশুদের চিতা আমি জ্বালাবই। মশাল এসেছে ‘মিশাল’ থেকে। বঙ্গীয় শব্দকোষ মতে তা আগুন জ্বলা বাতি, অন্ধকারে যার আলো পথ দেখায়। রাজনৈতিক পতাকাতে ধুলো থাকে। অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে সে পতাকা সরিয়ে রাখাই ভালো। সাধারণত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অসহ্য শাসকরা পতাকা আক্রমণ করে নিজেদের অন্যায় লুকোতে চায়।

আর.জি. করের ঘটনা ভারত আর পৃথিবীর মানুষকে অশান্ত করে তুলেছে। আচার্য চাণক্যের কথায় মমতার লুকোনো পাপ মানুষের ঘাড়ে এক মহাভূত হয়ে চেপেছে। তা ছাড়াতে মানুষ পথে নেমেছে। গত ১৪ আগস্টের রাত দখল এবং শঙ্খধ্বনির রবে মা-বোনেদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ রাজ্যে নতুন স্বাধীনতার সূর্যোদয়। মমতা সে ঝড় মানতে নারাজ। বালিতে মাথা ঢুকিয়ে রেখেছেন। মিথ্যা আর কপটাচরণ করছেন। অহমিকা-সর্বস্বদের এই মূর্খামি নতুন নয়। ইন্দিরা থেকে সিদ্ধার্থশঙ্কর আর জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেবরা তার প্রমাণ। ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন। এখন ‘মমতা রাজ্য ছাড়ো’ আন্দোলন। ‘রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ’। যারা ন্যায়বিচারের জন্য গর্জন করতে করতে মমতার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন আমি তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা বিচার চান। মমতাকে রাজ্য ছাড়া করা তাঁদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়।

পতাকাহীন সে আওয়াজে মমতা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁর বিরোধী পতাকাকে আক্রমণ করে কুকীর্তি ঢাকার খেলা তাই বানচাল হয়ে গিয়েছে। ‘ভিকটিম কার্ড’ বা ন্যাকা আক্রান্ত সেজে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। মমতা অতি সাধারণ এক আদি কংগ্রেসি রাজনীতিবিদ। ব্যক্তিগত ক্ষোভে আলাদা দল গড়েছিলেন। রাজ্যের নয়, নিজের আর পরিবারের ভালোর জন্য সে দল তৈরি হয়েছিল। গত তেরো বছরে রাজ্যের মানুষ হাড়ে-মজ্জায় তা টের পেয়েছেন। অনেকের দাবি, কর্দমাক্ত কেচ্ছা আর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণেই মমতা শাসক হওয়ার অনুপযুক্ত। সবকিছুকে চক্রান্ত বলে দেখা তাঁর বিকার। অনেকেই জানেন, আর.জি. করের অভিযুক্ত দাগি অধ্যক্ষ মমতার এক প্রয়াত ঘনিষ্ঠের আত্মীয়।

পুলিশ একসময় মমতার সমর্থকদের উপর গুলি চালাতে পিছপা হতো না। সেই দলদাস দিয়ে এখন মমতা সাংবাদিকদের ভয় দেখাচ্ছেন, ডাক্তারদের তলব করছেন, এমনকী দলের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা, সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়কেও পুলিশ দিয়ে ডাকিয়ে জেরা করার হুকুম দিচ্ছেন। একেই বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি! গত ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে আড়াল থেকে তার দলের কুচো নেতা-মন্ত্রী আর কাউন্সিলররা জেহাদি বাহিনীকে ব্যবহারের মাধ্যমে দুষ্কৃতীরাজ তৈরি করে আর.জি. কর হাসপাতাল ভাঙচুর করে দিয়েছেন। গুন্ডামি করে রাজ্যের আইনসভা ভাঙচুর করার শিক্ষা মমতার দলের রয়েছে। তাই হাসপাতালকে ভেঙে ফেলা তাদের কাছে আলাদা কিছু নয়। মমতা প্রমাণ করতে চান ‘আমার কন্যা’র মৃতদেহকে ব্যবহার করে বিরোধীরা তাকে উৎখাতের চক্রান্ত করছে। ফয়দা তুলতে বিষয়টি রাজনৈতিক করতে চান।

আর.জি. করে মমতা বাহিনীর তাণ্ডব আর নরককাণ্ডের পর মনে হয় না মানুষ তাতে কান দেবে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ফুটবল ময়দান থেকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি ‘জোট বেঁধেছে বাঙ্গাল ঘটি—ভয় পেয়েছে হাওয়াই চটি’। অর্থাৎ, ‘আমার কন্যা’কে ন্যায়বিচার দিতে জেগে উঠছে জনতা, তাই ভয় পেয়েছেন মমতা। তাই রাজ্যের সকলের কাছে আবেদন, আপাতত পতাকা ছাড়ুন। প্রতিবাদের মশাল ধরুন। মমতার মহাভূতকে তাড়িয়ে এই অমানিশায় তা আলোর পথ দেখাবেই। কোনো রাজনীতি নয়, রাজ্যজুড়ে মমতার জারি করা এই অঘোষিত জরুরি অবস্থার অবসান হোক সংবিধানের ৩৫৫ ধারার প্রয়োগে, কেবল সামাজিক কারণে আর আমার বহু কন্যার ন্যায়বিচার দিতে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

পতাকাহীন আওয়াজে মমতা আজ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁর বিরোধী পতাকাকে আক্রমণ করে কুকীর্তি ঢাকার খেলা বানচাল হয়ে গিয়েছে।

খেলার মাঠে দিদি বড্ড 'একা'

একেলাষু দিদি,

আজ দিদি বড়ো সঙ্কট। পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও আপনার বেশি। এককালে যেমন বসন্ত রোগীকে একে একে সবাই ছেড়ে চলে যেত তেমন হাল হয়েছে আপনার। দিনে দিনে সেটা বাড়বে দিদি। আমি জানি, কিছু মানুষকে আপনি ক্রীতদাস বানিয়ে ঘরে বসিয়ে রেখেছেন। কিন্তু দিদি, এটাও জেনে রাখুন সেই ক্রীতদাসদের 'মার্কেট ভ্যালু' বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সেই তালিকায় শুভাপ্রসন্ন, জয় গোস্বামী থেকে তাবেদার সাংবাদিক। আর দিদি আপনার ভাইয়েরা যাঁরা গুন্ডাগিরি করেই পেট চালায় তাদের উপায় নেই বলে। তবে এটাও মনে রাখবেন, বিবেক রয়েছে এমন আপনার নিজস্ব সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, নেতা ভাই-বোনেরাও যে চুপ রয়েছে সেটা আপনাকে একলা করে দেওয়ার জন্যই।

আপনার বড়ো প্রিয় 'খেলা হবে' স্লোগান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে খেলা শুরু হয়েছে তা কিন্তু মোটেও ছেলেখেলা নয়। এ খেলায় মানুষ সব বাজি রাখতে তৈরি। রাস্তায় নামার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আপনার এই বিপদের সময়ে ভাইপোও কিন্তু পাশে নেই। মেঘনাদের মতো আড়াল থেকে আরজি করে 'গেঞ্জি-বারমুডা' বাহিনীর হামলার রাতে একটা চাপ বাড়ানো বার্তা পাঠানো ছাড়া তিনি কোথাও নেই। দূর থেকে 'বুড়ি কবে গদি ছাড়বে' এই অপেক্ষায়।

দিদি, আপনি মনে করেছিলেন সব মানুষকে কিনে নেবেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে মহিলাদের কিনে নেবেন। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী দিয়ে মেয়েদের। হ্যাঁ দিদি, ভোট কেনার ক্ষেত্রে আপনি অনেকটাই সফল। কিন্তু দিদি বিবেক যে কিনতে পারেননি সেটা বলে দিচ্ছে এ রাজ্যের পথ। প্রতিদিন নানা রূপে যে ভাবে মানুষ রাস্তায় নামছেন সেটা কিন্তু এই ভারতে কোনও কালের কোনও ইতিহাসে নেই। অনেক কিছু নিয়েই আপনার উপরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল এবং আছে। সেটা মানুষ ভয়ে চেপে রেখেছিল। কিন্তু এখন ভয় উপেক্ষা করে রাস্তায়। চূড়ান্ত 'খেলা হবে' জেনেও তারা তৈরি। এ কিন্তু দিদি আত্মরক্ষার সময়। আপনি নিজেও সেটা বুঝেছেন। তাই তো বলেছেন, বাংলাদেশ করতে চাইছে সবাই। হাসিনা করতে চাইছে আপনাকে।

দিদি, একটা উদাহরণ দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে মানুষ ভয় কাটিয়ে উঠেছেন। আপনি যখন 'খেলা হবে' দিবস চালু করেছিলেন তখনই এরাজ্যের ক্রীড়ামোদীদের গর্জে ওঠা উচিত ছিল। কারণ, আপনি ফুটবলপ্রেমীদের অসম্মান করেছিলেন। ১৬ আগস্ট 'খেলা হবে' দিবস পালন করে রাজ্য সরকার। এই দিনেই কলকাতায় ভয়ংকর দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল ইডেন গার্ডেন্স। অনেকের মৃত্যুর সাক্ষী হয় কলকাতা ১৯৮০ সালে। সেই ঘটনার পরে এই দিনটিকে 'ফুটবলপ্রেমী' দিবস হিসেবে পালন করা হতো। সেই দিনটিকেই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনি 'খেলা হবে' দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি। কিন্তু আপনি যে দিন বলবেন 'খেলা হবে না' সেই দিন পশ্চিমবঙ্গের ফুটবলমোদীরা আপনাকে পালটা বলে দিবেন 'খেলা হবেই'।

দিদি, পুলিশ হাসপাতালে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। সেই অবস্থায় খেলার মাঠে কী করে দেবে? এই প্রশ্ন তুলেই সল্টলেক স্টেডিয়ামে বহু প্রতিক্ষিত ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্যাচ বাতিল করে দিল। বেশ করেছে। এর জবাবে দুই ক্লাব একত্রে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিল। সেদিন অবশ্য প্রচুর পুলিশ নামিয়ে আপনি পুলিশমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, ম্যাচ করার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ থাকলেও ভয়েই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। তার পরে তো অনেক কিছুই ঘটেছে। সে সব বাদ দিয়ে আপনার একা হয়ে যাওয়ার কথাটা বলি।

মাঠের লড়াই, গ্যালারির লড়াই ছাড়াও সারা বছর ফেসবুকে লড়াই চলে। হাতাহাতির উদাহরণও কম নেই। কিন্তু আপনার প্রতি প্রতিবাদ প্রমাণ করল, বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিচিত থেকেও মানুষ উত্তীর্ণ হতে পারে ভিন্নতর সম্মিলিত পরিচিতিতে।

ম্যাচ বাতিলের পরে সমাজমাধ্যমে একটা কথা খুব ঘুরছিল। লেখা ছিল— 'মহামেডানের একজন মহিলা সমর্থক ভয় পেয়েছেন বলে প্রথমবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ বাতিল।' কিন্তু পরে দেখা গেল আপনি সমর্থন করলেও মহামেডানও আপনার পাশে নেই। শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে সমর্থকেরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে, পরস্পরের পতাকা হাতে আরজি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচার চাইলেন। মোহনবাগানের সমর্থক ইস্টবেঙ্গলের সমর্থককে তুলে নিলেন কাঁধে। এরাজ্যের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত রচিত হলো। ইস্টবেঙ্গল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের ক্লাব হিসেবে পরিচিত, মহামেডান স্পোর্টিংয়েরও জন্ম হয়েছিল ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমানদের ক্লাব হিসেবে। মোহনবাগানের পরিচিতিও মূলত পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের পছন্দের ক্লাব হিসেবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এর কোনও পরিচিতিকেই একমাত্র সত্য বলে ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ক্লাবের সমর্থকদের সিংহভাগ এখনও এই পরিচিতিগুলির প্রতি নিষ্ঠাবান। মাঠের লড়াই, গ্যালারির লড়াই ছাড়াও সারা বছর ফেসবুকে লড়াই চলে। হাতাহাতির উদাহরণও কম নেই। কিন্তু আপনার প্রতি প্রতিবাদ প্রমাণ করল, বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিচিত থেকেও মানুষ উত্তীর্ণ হতে পারে ভিন্নতর সম্মিলিত পরিচিতিতে। এখন সেই পরিচিতির ছবি গোটা রাজ্যে। সব ক্ষেত্রের মানুষ এক ভিড়ে দাঁড়িয়ে আপনার অপসারণ চাইছেন।

দিদি, আপনি সত্যিই খুব একা। □

বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনায় ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজন বিচারবিভাগীয় সংস্কার

ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের প্রাপ্য ন্যায়বিচারের সঙ্গে সেই মানুষদের ভাষার মেলবন্ধনও জরুরি। দেশের মানুষ যাতে আইন ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত হতে পারেন, বিচার প্রক্রিয়ায় আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে রাজ্যগুলির স্থানীয় ভাষায় আদালতের কার্যপ্রণালী পরিচালনার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বিশেষ জরুরি।

অতিথি কলম

আশিস রাই

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলির কাজ কোন ভাষায় চলবে তা ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থিরীকৃত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রদত্ত সাংবিধানিক নির্দেশ হলো— সুপ্রিম কোর্ট-সহ হাইকোর্টগুলিতে ইংরেজি ভাষায় বিচারবিভাগীয় কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হবে। যতদিন না সংসদের মাধ্যমে এই বিষয়ে কোনো পৃথক আইন প্রণীত হবে, ততদিন এই নিয়ম বলবৎ থাকবে। সংবিধানের ৩৪৮(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশ হলো— হিন্দি বা রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষায় সেই রাজ্যের হাইকোর্টের কাজকর্ম পরিচালনার বিষয়ে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁর ইচ্ছানুযায়ী, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের অনুমোদন-সাপেক্ষ। হাইকোর্টের দ্বারা জারি কোনো নির্দেশ বা হাইকোর্ট প্রদত্ত কোনো ডিক্রি বা রায় লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার বিষয়ে কিন্তু সংবিধান বর্ণিত এই নির্দেশটি প্রযোজ্য নয়। এই ক্ষেত্রে 'দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজেস্ অ্যাক্ট' বা 'রাজভাষা অধিনিয়ম, ১৯৬৩'-আইনের ৭ নম্বর ধারায় একটি নির্দিষ্ট আইনি বিধানের উল্লেখ রয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টগুলির তরফে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কোনো নির্দেশ জারি বা রায়দানের ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষা বা প্রাদেশিক স্তরে স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে হাইকোর্টের তরফে নির্দেশ জারি বা রায়দানের ক্ষেত্রে ইংরেজি ছাড়া হিন্দি বা রাজ্যের স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারেন কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল।

বিচারবিভাগে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বাধা : 'ওরা সংবিধান পালটে দেবে' জাতীয় একটি অপপ্রচার ইদানীং ভারতীয় সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে গোটা দেশকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। কিছু রাজনীতিক আবার সংবিধানের একটি করে ক্ষুদ্র সংস্করণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন। যদিও সংবিধানের মূল ভাবনাকে ১৯৬৫ সালেই অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। সেই বছরের ২১ মে তারিখে ভারত সরকারের ক্যাবিনেট কমিটি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্যাবিনেট কমিটির ঘোষিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে কোনো হাইকোর্টে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে গৃহীত যে কোনো প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা সিজেআই-এর সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক। এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব আসতে থাকে। সেই প্রস্তাবগুলির ক্ষেত্রে ১৯৬৯ সালে উত্তরপ্রদেশে, ১৯৭১ সালে মধ্যপ্রদেশে ও ১৯৭২ সালে বিহারে— এই তিনটি রাজ্যের হাইকোর্টগুলির কাজে হিন্দি ভাষা প্রয়োগের অনুমতি মিললেও, পরবর্তী অধ্যায়ে এই রাজ্যগুলি ভেঙে উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হলে এই রাজ্যগুলির হাইকোর্টগুলিতে হিন্দিতে কাজকর্ম চলার প্রয়োজনীয় অনুমতি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সংবিধানের ৩৪৮(২) অনুচ্ছেদের দ্বারা প্রদত্ত সুবিধা ১৯৫০ সালেই গ্রহণ করে রাজস্থান। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৬৩ সালে প্রণীত রাজভাষা অধিনিয়মের ৭ নম্বর ধারার প্রয়োগে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার-স্থিত হাইকোর্টগুলিতে হিন্দি ভাষায় আদালতের কাজকর্ম, শুনানি-সহ নির্দেশ-ডিক্রি জারি ও রায়দানের অনুমতি প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তামিলনাড়ু, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক ও ছত্তিশগড় সরকার নিজেদের রাজ্যের হাইকোর্টগুলিতে যথাক্রমে তামিল, গুজরাটি, বাংলা, কন্নড় ও হিন্দি ভাষায় কাজকর্ম পরিচালনার অনুমতি চেয়ে সেই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব প্রেরণ করে। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যসমূহ প্রেরিত এই প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রীয় সরকার যথারীতি অনুমোদনের জন্য সিজেআই-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়। ২০১২ সালের ১৬ অক্টোবর তৎকালীন সিজেআই-এর তরফে কেন্দ্রকে জানানো হয় যে বিচারবিভাগের শীর্ষস্তরে আলাপ-আলোচনার পর এই প্রস্তাবগুলিকে খারিজ করার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপর তামিলনাড়ু সরকার দ্বিতীয় বার কেন্দ্রকে একই অনুরোধ জানালে ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যস্তরে হাইকোর্টগুলিতে হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তরফে নমনীয়তা প্রার্থনা করে, আগের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার ব্যাপারে

পুনরায় সিজেআই-এর কাছে সম্মতি চায় কেন্দ্র। কিন্তু ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন সিজেআই ফের সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন।

২০১৭ থেকে শুরু পট পরিবর্তন : ২০১৪ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হলে ভারতীয় বিচারবিভাগের ভারতীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। হিন্দির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় আদালতের কাজকর্ম পরিচালনার বিষয়টিও ছিল এর অন্তর্গত। দেশজুড়ে ২৪,৬৫৯ জন বিচারক কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে ৯৫.৭ শতাংশ বিচারক স্থানীয় ভাষাতেই বিচারের কাজ পরিচালনা করে থাকেন। বাকি ৪.৩০ শতাংশ বিচারক সংবিধানের ৩৪৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ইংরেজিতে আদালত পরিচালনার বিষয়ে বিশেষাধিকার প্রাপ্ত। এদের ৪.১৭ শতাংশ হলেন হাইকোর্টগুলির বিচারপতি এবং ০.১৩ শতাংশ হলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি।

সংবিধান প্রদত্ত এই বিশেষাধিকারের কারণে বিচারবিভাগে আজও পুরোপুরি বিরাজ করে না ভারতীয় পরিবেশ। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কোনো সাংবিধানিক নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালে এই ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঠিক কী ধরনের বাধ্যবাধকতা ক্যাবিনেট কমিটির ছিল? সংবিধানের ৩৪৮(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রের কাছে কোনো রাজ্যের তরফে জমা পড়া প্রস্তাবের বিষয়ে সিজেআই বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির অনুমোদন গ্রহণের এই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি সংবিধান-বহির্ভূত প্রক্রিয়া। এই কারণে সংবিধান-বহির্ভূত এই রীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে প্রতিবাদ। বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত আন্দোলনের মাধ্যমে বিচারবিভাগে ভারতীয় পদ্ধতি প্রণয়নের দাবিসমূহ উত্থাপিত হতে থাকে। বিশেষত তামিলনাড়ুতে এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট কমিটির দ্বারা গৃহীত এই সিদ্ধান্ত ২০১৭ সালে 'অসাংবিধানিক' বলে মনে করে পার্সোনেল (কর্মীবর্গ), পাবলিক গ্রিভান্সেস (জন-অভিযোগ), ল' অ্যান্ড জাস্টিস (আইন ও বিচার) মন্ত্রক সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। বিষয়টি পর্যালোচনা করে সংসদীয় কমিটি তার রিপোর্টে সুপারিশ করে যে হাইকোর্টগুলিতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিজেআই-এর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক নয়, কারণ সংবিধানের ৩৪৮ নং অনুচ্ছেদে এই প্রক্রিয়ার কোনো উল্লেখ নেই।

কমিটি অফ পার্লামেন্ট অন অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ বা সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিও হাইকোর্টগুলিতে হিন্দি ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে সুপারিশ করে। আইন ও বিচার মন্ত্রক সেই সুপারিশটিকে ল' কমিশন অফ ইন্ডিয়া বা বিধি আয়োগের কাছে পাঠিয়ে এই বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানতে চায়। প্রাক্তন সিজেআই এমএন বেঙ্কটচলিয়া ল' কমিশনে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন— 'আমাদের সংসদীয় সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে সব দিক বিচার করে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করা উচিত'। তিনি এই মত পোষণ করলেও ২০০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর অষ্টাদশ বিধি আয়োগের চেয়ারম্যান তামিলনাড়ু নিবাসী প্রাক্তন বিচারপতি এ.আর. লক্ষ্মণন বিচার-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তাঁর পেশ করা ২১৬ পৃষ্ঠার রিপোর্টে অন্যরকম সুপারিশ করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন ল' কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে সংস্কারের পরিচয়বাহী হলেও সর্বোচ্চ বিচারবিভাগের উপর কোনো প্রকার পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়া এই সামাজিক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অনুচিত।

হিন্দি আজও উপেক্ষিত : প্রাক্তন সিজেআই এনভি রামান্না বা বর্তমান সিজেআই ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়— নানা সময়ে বিচারবিভাগের ভারতীয়করণের পক্ষে সওয়াল করে গিয়েছেন। রাজভাষা অধিনিয়ম, ১৯৬৩-র ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টগুলিতে ভারতীয় ভাষায় কাজকর্ম পরিচালনার দাবিতে আন্দোলন জারি রেখেছে 'ভারতীয় ভাষা অভিযান'।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় দেশজুড়ে জেলাস্তরের বিভিন্ন আদালতগুলিতে আঞ্চলিক ভাষায় কাজকর্ম শুরু হলেও বহু জেলা আদালতে ইংরেজির বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। জেলাস্তরের আদালতগুলিতে কোন ভাষায় কাজকর্ম পরিচালিত হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার রাজ্য সরকারগুলির থাকলেও নিজেদের কিছু সুযোগসুবিধার ওপর জোর দিয়ে নানা মহলের তরফে অন্যান্য আদালতগুলিতে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কিত আইনি বিধানকে চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়।

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির জেলা আদালতগুলিতে হিন্দিতে কাজ করার আইনি বিধান থাকলেও এই আদালতগুলির কাজকর্ম ইংরেজিতে পরিচালিত হয়। দিল্লিতে জারি থাকা এই প্রক্রিয়ার প্রভাব অন্য রাজ্যগুলির উপরেও পড়তে দেখা যায়। দুই পক্ষের আইনজীবীর অসম্মতি সত্ত্বেও সাক্ষীদের বয়ান ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে থাকে। আদালতগুলির তরফে ইংরেজি ভাষায় নির্দেশ জারি ও রায়দানের প্রক্রিয়া চলে, যার ভুক্তভোগী বিচারপ্রার্থী অসংখ্য মানুষ।

২০১৪ সাল থেকে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। হিন্দির বিরোধিতায় ইংরেজির ব্যবহারের কৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইংরেজির এই রমরমা রুখতে বিচারবিভাগের সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি একটি দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। দাবিটি হলো— সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলিতে সব ভারতীয় ভাষায় কাজকর্ম পরিচালিত হোক। তার সঙ্গে জেলা আদালতগুলির কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির দ্বারা স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষায় পরিচালিত হোক। ২০১৭ সালে কেরালা হাইকোর্টের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেন যে হাইকোর্টের রায়দান সেই ভাষাতেই হোক, যা বিচারপ্রার্থীদের কাছে সহজবোধ্য।

২০২২ সালের ৩০ এপ্রিল একটি অনুষ্ঠানে তৎকালীন সিজেআই এনভি রামান্নার উপস্থিতিতে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের প্রাপ্য ন্যায়বিচারের সঙ্গে সেই মানুষদের ভাষার মেলবন্ধনও জরুরি। দেশের মানুষ যাতে আইন ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত হতে পারেন, বিচার প্রক্রিয়ায় আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে রাজ্যগুলির স্থানীয় ভাষায় আদালতের কার্যপ্রণালী পরিচালনার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বিশেষ জরুরি। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের আগে ২০২১ সালের ১৩ নভেম্বর কাশীতে প্রথম অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শা উল্লেখ করেন যে নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই ন্যায়বিচার সাধারণ মানুষের প্রাপ্য।

(লেখক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী)

শক্তিশালী হচ্ছে ভারতের নৌবহর

চীনা আগ্রাসন রুখতে নৌবহর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত তিন বছর আগেই নিয়েছিল ভারত। ২০২১ সালে মার্চ মাসের শুরুতেই সফলভাবে নতুন এআইপি প্রযুক্তির অন্তিম পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ডিআরডিও। এই এআইপি প্রযুক্তির মাধ্যমে একটানা বহুক্ষণ জলের নীচে থাকতে পারবে সাবমেরিন। আপাতত ভারতীয় নৌবাহিনীর সাবমেরিনগুলিতে তা প্রয়োগের উদ্যোগও সফলভাবে গৃহীত হয়েছে। নয়া প্রযুক্তির প্রয়োগে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আরও শক্তি বৃদ্ধি পাবে ভারতের। তবে এই প্রযুক্তির প্রয়োগকে বিজ্ঞান বা সামরিক প্রযুক্তির পাশাপাশি কূটনৈতিক কৌশলের অঙ্গ হিসেবেও বিবেচনা করছেন তথ্যভিজ্ঞ মহল। তাঁদের মতে, এটা দেশের নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন পরিকল্পনারই একটি অংশমাত্র। সেই সময়ই পাখির চোখ করা হয়েছিল পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন-কে। ভারতীয় নৌবাহিনীর ছ'টি পারমাণবিক-শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ (সাবমেরিন) পরিকল্পনা হয় তখনই। এর আগে নৌবাহিনীর হাতে মাত্র দুটি এধরনের পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন ছিল। এদেরও প্রযুক্তিগত উন্নত করে তোলার পরিকল্পনা ছিল।

কিন্তু 'প্রজেক্ট ডেল্টা'র মাধ্যমে ভারতের পারমাণবিক শক্তি চালিত ডুবোজাহাজের (সাবমেরিন) ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা, ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে ক্রমশ বিলম্বিত হয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ভারতীয় নৌবাহিনী দুটি পারমাণবিক শক্তি চালিত সশস্ত্র সাবমেরিন (এসএসএন) তৈরির অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে মোদী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৩০ বছরের পুরনো সাবমেরিন পরিকল্পনায় ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ছ'টি এসএসএন-কে অনুমোদন দেয়। তারমধ্যে প্রথমে দুটি এসএসএনের জন্য বিষয়টি একদম শীর্ষ পর্যায়ের তোলা হয়েছে এবং ওই প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনাও চলছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, ভারতের দ্বিতীয় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র— সশস্ত্র ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত সাবমেরিন, এসএসবিএন আইএনএস অরিঘাত, শীঘ্রই প্রথম এসএসবিএন আইএনএস অরিহন্তের সঙ্গে যুক্ত হবে। আইএনএস অরিহন্ত ইতিমধ্যেই ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে টহল দিচ্ছে। এদিকে, ভারতের তৃতীয় এসএসবিএন আইএনএস অরিদমন, দেশের শক্তিশালী পারমাণবিক ত্রয়ীর অংশ হিসেবে ২০২৫-এর গোড়াতেই চালু করার প্রস্তুতিও চূড়ান্ত।

অন্যদিকে, প্রজেক্ট ডেল্টার অন্তর্গত রাশিয়ান আকুলা ক্লাসের এসএসএনের প্রস্তাবিত লিজ, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার ব্যবস্ততা এবং প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞার কারণে দীর্ঘায়িত হয়েছিল। এর জন্য অন্তত ২০২৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় নৌবাহিনী এসএসএন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুম্বইয়ের মাজগাঁও ডকইয়ার্ডে। যেখানে তিনটি কালভারি (স্করপিন) ক্লাসের ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিন তৈরি করা হচ্ছে।

ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনাবিদদের এসএসএন বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ হলো, এর কর্মক্ষমতা ও উন্নত প্রযুক্তি। এসএসএনের গতি হলো জলের নীচে ঘণ্টায় কুড়ি নটিক্যাল মাইল। কিন্তু এসএসকে বা ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিনগুলির গতি হলো শুধুমাত্র এয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রপালশন-সহ ঘণ্টায় চার থেকে পাঁচ নটিক্যাল মাইল।

উল্লেখ্য যে, চীনের নৌবাহিনীর ভারত মহাসাগরে দূরপাল্লার টহলের পরিকল্পনা রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে ইউয়ান-শ্রেণীর এসএসকে দিয়ে তারা সজ্জিতও করেছে। ভারতও তার এই প্রধান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাদের মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েছে। এদিকে, এসএসএনের ওপর ফোকাস করার আরেকটি কারণ হলো, যে এসএসবিএনগুলি শুধুমাত্র পারমাণবিক প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি ভারতের দ্বিতীয়-স্ট্রাইক ক্ষমতার অংশ। ভারতের প্রথম চারটি এসএসবিএনগুলির প্রত্যেকটিই অরিহন্ত শ্রেণীর। যেখানে ৭৫০ কিলোমিটার রেঞ্জের কে-১৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত থাকবে এবং পরবর্তী শ্রেণীটি তিন হাজার কিলোমিটার রেঞ্জের কে-৪ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত হবে। এমতাবস্থায়, ভারতীয় নৌবাহিনী সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী করতে এবং নজরদারি ভালোভাবে বজায় রাখতে সকারের কাছে দুটি নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিনের বিষয় উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভারতের এই পরিকল্পনাগুলির মূলে রয়েছে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শক্তি প্রদর্শন ও দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকেও বড়ো নৌবহর রয়েছে চীনের। যদিও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে আমেরিকা। এক্ষেত্রে জলে আধিপত্য বজায় রাখতে হলে শক্তি বৃদ্ধিই একমাত্র পথ। আর সেই কারণেই একের পর এক নয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় নৌবাহিনী, মতো সমর-বিশেষজ্ঞদের।

অন্যদিকে ভারত মহাসাগরে ক্রমেই বাড়ছে চীনের আস্ফালন। চীনের ক্যারিয়ার স্ট্রাইক ফোর্সের উপস্থিতিকে একেবারেই সুনজরে দেখছেন না ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা। আর সেই কারণেই যুক্ত করা হচ্ছে নতুন এয়ারক্র্যাফ্ট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিন। এ প্রসঙ্গে ওয়েস্টার্ন ন্যাভাল কমান্ডের প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) ভাইস অ্যাডমিরাল মদনজীৎ সিংহ তিন বছর আগে যথার্থই বলেছিলেন, 'চীনা আগ্রাসন রুখতে হলে মোদী সরকারকে আবশ্যিকভাবে নেভির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।' সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে দেশের নৌবাহিনী। □

'অবনত ভারত চাহে তোমারে এসো সুদর্শনধারী মুরারি'

তুমিই তো একদিন কংসকে ধ্বংস করে মথুরাবাসীকে রক্ষা করেছিলে, দ্রৌপদীর লাজ রেখেছিলে। আজ শতশত দ্রৌপদী আক্রান্ত। চারিদিকে সহস্র 'দুঃশাসন'। তাদের পাপের ঘড়া কি আজও পূর্ণ হয়নি ভগবান?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠি

আজ থেকে প্রায় ৫৫০ বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশের নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা করেছিলেন বাঙ্গালি জাতিকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কেবল ভক্তির ঠাকুর হিসেবে না দেখে শক্তির দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার কাছে কৃষ্ণনাম ছিল একটি শক্তিশালী আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। মুসলমান শাসক ও প্রশাসক চাঁদ কাজীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূল হাতিয়ারই ছিল 'হরিবোল' ধ্বনি। তাই বংশীধারী কৃষ্ণের ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে চক্রধারী কৃষ্ণের শক্তির রণহুংকার— এই ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণভাব- আন্দোলনের মূল উপজীব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসের সঙ্গে সঙ্গে তার বীররসের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বঙ্গ ও বাঙ্গালিকে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বের পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর বোমা মামলা থেকে মুক্ত হয়ে ১৯০৯ সালের ৩০ মে উত্তরপাড়ায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' নামে অমর হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, কারাগারে কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল তাঁর। শুধু তাই নয়, কারাগার থেকেই পেয়েছিলেন আগামীদিনের পথনির্দেশ। সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ বংশীধারী কৃষ্ণের নয়, চক্রপাণি নারায়ণের। ভাষণের অন্তিমে তিনি বলেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তার অনুভূতি 'সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা'।

'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সুদর্শনধারী মুরারি'— এটি কাজী নজরুলের একটি গানের দু'টি কলি। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে অত্যাচারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি এভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করেছিলেন। দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে প্রেমরসে সিঞ্চিত বংশীধারী কৃষ্ণ নয়, কুরুক্ষেত্রের চক্রধারী অসুরসংহারী নারায়ণকে তিনি এদেশে আহ্বান করেছিলেন। যে বাঙ্গালি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বীররসে জারিত হয়ে বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সহস্র বছর ধরে লড়াই করল, দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিল, প্রতাপাদিত্য, বিজয় সিংহ হতে শুরু করে ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা— যে গীতার বাণীকে সম্বল করে হাসতে হাসতে মৃত্যুভয় জয় করলেন, দেশের জন্য জীবন দিলেন, সেই বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ আজ কোথায়? যে বঙ্গে যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির মন্ত্রগুপ্তির দীক্ষা হতো গীতায় হাত রেখে, কর্মযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, স্বাধীনতার মাত্র ৭৭ বছরের মধ্যে সেই বাঙ্গালি জাতি গীতার সেই বীরত্বের ইতিহাস ভুলে গেল। তাকে কেবল শ্মশান যাত্রীর বুকে ঠাঁই দিয়ে মোক্ষ প্রাপ্তির 'গ্রন্থ' রূপে প্রতিষ্ঠা করল। বাঙ্গালি ভুলে গেল শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা পরপারের 'পারানি' নয়, জন্ম হতে আমৃত্যু জীবন গঠনের পথনির্দেশ।

এ হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী গীতাকে না বোঝার ফল। শ্রীকৃষ্ণের জীবন অনুসরণ করলে নর যে নারায়ণ হয়ে উঠতে পারে, এ বিশ্বাস আজ বাঙ্গালির নেই। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে তিনি বলেছিলেন, 'পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' অর্থাৎ জগতে যখন অধর্ম অনাচার প্রবল হবে, তখন আমি দুষ্কৃতীদের বিনাশ করতে অবতীর্ণ হব— এই বিশ্বাস বাঙ্গালি করে না। অথচ যুদ্ধে দ্বিধাগ্রস্ত অর্জুনকে তিনি বলেছিলেন— সামনে প্রকাশ্য শত্রু। বসে না থেকে ওঠ, অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর। এ যুদ্ধ আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের নয়। এ লড়াই ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার। এর জন্য অস্ত্রধারণ অন্যায় নয়, এটাই ন্যায় নীতি। তাই গাণ্ডীব তোল যুদ্ধ কর। এই শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, মহাভারতের শিক্ষা, গীতার শিক্ষা। সেই শিক্ষা বাঙ্গালি বিস্মৃত হয়েছে।

সে কারণেই আজ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কামদুনি, মালদা, বহরমপুর, বসিরহাট, ক্যানিং ,উস্তি, নলিয়াখালি, উত্তরদিনাজপুর, সন্দেশখালি, আরজি করের দ্রৌপদীদের চরম দুর্দশা, বাংলাদেশে হিন্দুদের আত্মচিৎকার— তবু কি তাঁর দেখা মিলছে? না, মিলছে না। কিন্তু তিনি যে কথা দিয়েছেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে'— তবে তিনি আসছেন না কেন? কারণ তিনি আমাদের মধ্যে একটা অর্জুন, একটা ধর্মপুত্র, একটা ভীম খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি আসতে চাইছেন, হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তার প্রিয় পঞ্চপাণ্ডবকে, কিন্তু কেউ আমরা তা হতে রাজি নই। তবে তিনি আসবেন কী

ফঃ ২

করে? কাকে নিয়ে মহাভারত রচনা করবেন?

বাঙ্গালির রক্ত আজ শীতল। চারিদিকে দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ কিন্তু আমরা প্রতিবাদহীন। আমরা হয় মৌনমিছিলে, নয় মোমবাতি মিছিলে বিপ্লব করি। জানি না মাতৃজাতির লাঞ্ছনার প্রতিবাদে কে আমাদের হাতে মোমবাতি ধরিয়ে দিয়ে গেল! নইলে নারীর সম্মান রক্ষায় তিনি তো আমাদের লঙ্কাকাণ্ড আর কুরুক্ষেত্র করার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে মনে হতাশা আসে। ভাবনা আসে তুমি কি মিথ, কেবলই কল্পনা? এই সেদিন পশ্চিমবঙ্গের এক 'কংস' প্রকাশ্য সভায় চিৎকার করে বলল, 'আমরা ৭০, তোমরা ৩০। চাইলে যে কোনো সময় তোমাদের হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে ডুবিয়ে মারতে পারি'। তখন মনে প্রশ্ন এসেছিল, কই তুমি তো এলে না? তোমার 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র কথা রাখলে না? আবার যখন এই রাজ্যের এক 'কালযবন' বলল, 'এ বাংলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। তাই এখানে শরিয়তি আইন চলে'। ভাবলাম, এবার বুঝি পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে, এবার তুমি আসবে। তখনোও তুমি এলে না। আবার যখন কলকাতার এক 'শিশুপাল' শত পাপ পূর্ণ করে তোমার ভক্তদের বলল, 'ওরা, সনাতনীরা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। ওদের ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে'— আমরা সন্ত্রস্ত হলাম। ভাবলাম এবার তুমি নিশ্চয়ই ধর্ম রক্ষায় অবতীর্ণ হবে। এবারও তুমি নিশ্চুপ। আবার যখন এক 'ক্ষমতালোভী নেত্রী' তোমার এক ভক্তপ্রবর সন্ন্যাসীকে তুই-তোকারি করে সমগ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে নীচ-হীন বলে চরম অপমান করল— তখন ভাবলাম তুমি আসবেই আসবে। কিন্তু না, তখনও তুমি এলে না। তাই আমি তোমাকে মিথ্যে ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার দেওয়া কথা মিথ্যা। ভাবছিলাম যে তুমি দ্বাপরে শিশু অবস্থাতেই ছদ্মবেশী পুতনাকে কত সহজেই চিনেছিলে, তাকে হত্যা করেছিলে, সেই তুমি কলিতে হিজাব চড়ানো ছদ্মবেশী শয়তানগুলোকে চিনতে পারছো না কেন?

পরে ভেবে দেখলাম দোষ তোমার নয়। তুমি আজকের পুতনা, জরাসন্ধ, শিশুপাল, কালযবনদের ঠিকই চিনেছ, সঙ্গে সঙ্গে চিনেছ আমাদের মতো দুর্বল, কাপুরুষদেরও। তুমি বলেছিলে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য তুমি আসবে, কিন্তু আমরা কি সাধু? সত্যিই সাধু? আমরা তো অসাধু, প্রবঞ্চক, চোর, তস্য চোর। প্রতিনিয়ত ভাবের ঘরে চুরি করে মরছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা শঠতা, মিথ্যার জীবন আমাদের। আমরা তোমার অসুর বিনাশী রূপ চাপা দিয়ে কাপুরুষের মতো আত্মপ্রবঞ্চনা করে চলেছি। তবে আমাদের উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ হবে কেন? এমন কথা তো তুমি দাওনি! তুমি কুরুক্ষেত্রের বীর পঞ্চভ্রাতাকে সহায়তা করতে এসেছিলে। কিন্তু আমাদের মতো ভীরু, নির্বোধ, বীর্যহীন, কাপুরুষদের বাঁচাতে আসবে এ কথা তুমি কবে দিয়েছ?

তুমি গীতায় অর্জুনকে বলেছিলে 'হে অর্জুন হৃদয়ের দুর্বলতা ছেড়ে যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হও'। আর আমরা বাপ-ঠাকুরদার শ্রাদ্ধে ঘণ্টাখানিক গীতা পাঠ করে কর্তব্য শেষ করলাম। সেই বাণী যখন নিজের জীবনে ব্যবহারের সময় এল তখন দে-দৌড়। গীতার বাণী আত্মসাৎ করে ক্ষুদিরামের মতো মৃত্যুঞ্জয়ীরা হাসিমুখে ফাঁসি কাঠে ঝুলে পড়লেন, আর আমরা গীতা-কে বুঝলাম ব্রাহ্মণের দক্ষিণার দানের বস্তু। এভাবেই শত শত বছর ধরে আমরা শুধু দুর্বল হওয়ার সাধনাই করে গেলাম। তাই এখন আমাদের অবস্থা কেঁচোর মতো, যার ইচ্ছা দু' পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছে। শক্তির সাধনা করে দেশটার কী করে অস্তিত্ব বাঁচবে সে ভাবনা আমাদের নেই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন ১৬ নাম ৩২ অক্ষর হৃদয়ে রেখো। ব্যাস, আমরা ভক্তিরসে মজে গেলাম। কিন্তু তিনি যে বলেছিলেন, 'সঙ্ঘশক্তি কলি যুগে' অর্থাৎ কলিযুগে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ছাড়া গতি নাই— সেটা বেমালুম ভুলে গেলাম। চেপে গেলাম চৈতন্যদেবের আরাধ্য নারায়ণের হাতের চক্র আর গদার কথা। ভুলে গেলাম শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গুলের ডগায় মারণাস্ত্র সুদর্শনের কথা। সেসব ভুলে কেবল কৃষ্ণপ্রেমের ছেঁদো গল্প, আর টিকা, মালা, রসকলি, জপ, অহিংসার বুলি। শক্তির সাধনা নেই।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবলের দল যখন হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ করে কেঁদে বেড়াত, তখন তাদের কাছে যাওয়ার তাঁর সময় হতো না। কিন্তু যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের দল একবার ডাকলেই চলে যেতেন। কারণ, তারা বীর, শক্তির সাধক। কে কতটা কাঁদল, কেথলির ভেতর হাত পুরে ক' হাজার নাম জপ করল তা তিনি খোঁজ নেন না কোনোদিন। তিনি দেখেন আধার। দেখেন কে তাকে অনুসরণ করে। ভণ্ড ধার্মিকের ডাক ভগবান শোনেন না। তাঁকে ডাকলে নয়, অনুসরণ করলে তিনি আমাদের কাছে দৌড়ে চলে আসতেন। তা আমরা করছি কই? তাই শত ডেকেও তাঁর সাড়া নেই।

তবু ভগবান, তুমি একবার এসো। তুমি যে ঘুম ভাঙানিয়া। তুমিই তো দ্বাপরে অর্জুনের ঘুম ভাঙিয়েছিলে। তাকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে তার ভুল ধরিয়েছিলে। তুমি এসে আজ এই নির্জীব অবুঝ সমাজকে আর একবার তার ভুল ধরিয়ে দাও। তুমি এসে অবোধ হিন্দুর মন হতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করো। তাদের হাতে গাণ্ডীব ধরাও। বলো--- জাগ সনাতনী জাগ। তোমার মা-বোন লাঞ্ছিত, তোমার ধর্ম নিপীড়িত, সমাজ নিষ্পেষিত। তুমি ঘুমিয়ে আছ? ওঠ, অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর। সামনে প্রকাশ্য শত্রু। এখন শুয়ে থাকলে চলবে?

মঠ মন্দির মিশন প্রতিষ্ঠানের মাথাদের ঝুটি নাড়িয়ে বলো, 'নির্জীবের মতো ভক্তি করলে হবে? সেবা সেবা অভিনয় করলে হবে? আমি কি তোমাদের সে শিক্ষা দিয়েছিলাম? সব ভুলে গেলে? চারিদিকে এত অন্যায় অধর্ম দেখে নিশ্চুপ থাকবে? প্রতিবাদ কর, প্রয়োজনে অস্ত্র ধর'। তুমিই তো একদিন কংসকে ধ্বংস করে মথুরাবাসীকে রক্ষা করেছিলে, দ্রৌপদীর লাজ রেখেছিলে। আজ শতশত দ্রৌপদী আক্রান্ত। চারিদিকে সহস্র 'দুঃশাসন'। তাদের পাপের ঘড়া কি আজও পূর্ণ হয়নি ভগবান? তুমি এসো, আর একবার এসো। কথা দিচ্ছি এবার আমরা সব্যসাচী হবো, মধ্যমপাণ্ডব হবো, ধর্মপুত্র হবো। এসো হে পার্থ সারথি। একবার এসো। বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য।□

দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে স্বদেশে পরবাসী হয়ে দেশ হারানোর সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে

স্বপন কুমার মণ্ডল

১৯৪৭-এর আগস্ট মধ্যরাত্রিতে দেশের স্বাধীনতা লাভের কথায় আবেগমথিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, যখন সারা বিশ্ব ঘুমিয়ে, তখন ভারত জীবনে ও স্বাধীনতায় জেগে উঠবে। এই জেগে ওঠার মূলে যে মুক্তির আনন্দ ও স্বাধীনতার স্বাদ, তা ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবনে শরণার্থীর দেশ খুঁজে চলা, অন্তহীন পথচলা। অথচ দেশ মানে তো শুধু ঠিকানা নয়, মানুষের অস্তিত্বের আধার, নিজেকে প্রকাশের মুক্ত আকাশ, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মুক্ত জীবনানন্দ। তার ভূমিষ্ঠ হয়ে বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনের শৈশব-বাল্য-কৈশোরের আনন্দনিকেতন,

সেই দেশের স্মৃতিকে বিস্মৃতিতে রেখেই তাকে নতুন করে দেশের পরিচয় লাভ করতে হয়। অতীতকে ভুলে বর্তমানের স্বস্তিবোধে বিস্মৃতিতে শান্তি লাভের আশায় স্বদেশ ক্রমশ বিদেশ হয়ে ওঠে, পরদেশ আপনার মনে হয়। অথচ তারপরেও জীবনের ট্রাজিক পরিণতি একান্তে ভেসে ওঠে, সংবেদনশীল মানুষের

সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যা সেদিন অনুমান করা যায়নি, তা হলো, সেই দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় অসংখ্য মানুষ পরাধীনতাবোধে স্বদেশে পরবাসী হয়ে বিনিদ্রি জেগে ছিল। দেশের পূর্ব-পশ্চিম সীমান্তে বিচ্ছিন্ন দেশান্তরে অসংখ্য মানুষের উদ্বাস্তু জীবনে দেশ খুঁজে চলা আজও শেষ হয়নি। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পরে ১৯৭১-এ আবার শরণার্থীর ঢেউ আছড়ে পড়ে।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও দেশের সকলের কাছে তা স্বাধীনতা হয়ে ওঠেনি, বরং অসংখ্য মানুষের পরাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে তোলে। আবারও স্বদেশে পরবাসী হওয়া, ভিটেমাটি যৌবনের স্বপ্নরঙিন হাতছানি, প্রৌঢ়ের মান্যতা, বৃদ্ধের অভিভাবকত্ব, প্রবৃদ্ধের শ্রদ্ধাবোধ সবই তাতে মজুত থাকে। এজন্য দেশভাগে মানুষ ভাগ হয়, তার মনেও ভাগের রেশ এসে পড়ে, কিন্তু মানুষ কখনওই দেশত্যাগ করতে পারে না। তার মনে দেশই যে আলো হয়ে রয়ে যায়। যেখানে সে যায়, দেশও তার সঙ্গে চলে। লীলা মজুমদার তাঁর 'ডোরাকের গল্প'-এ যথার্থই বলেছেন, 'বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না।' মানুষের মনেই যে তার দেশের বাস। অথচ দেশভাগের শিকার হয়ে স্বদেশে পরবাসীরা মনে স্বদেশের নামটি উচ্চারণের ভয়ই তাকে গ্রাস করে।

লেখনীতে উঠে আসে, নাটক-সিনেমায় প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে আধুনিক বিশ্বে দেশের স্বাধীনতালাভের উচ্ছ্বাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে স্বদেশে পরাধীনতার শিকার হয়ে উদ্বাস্তু জীবনে দেশ খুঁজে চলার মর্মান্তিক পরিণতি আরও বেশি ভাবিয়ে তোলে। করোনাকালে আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষের ছুটে চলা বা অন্যদেশে বন্দি হওয়ার খবরও বন্ধ হয়নি। শরণার্থীদের আশ্রয়ে এত বড়ো পৃথিবীও ছোটো মনে হয়।

আসলে মানুষের মানবিক মুখেও উগ্র দেশপ্রেমের নির্মম প্রত্যাখ্যান আমাদের সচকিতও করে না। সেদিক থেকে কারও স্বাধীনতাই কারোর পরাধীনতার কারণ, ছিন্নমূল মানুষের দেশ খুঁজে চলার শরিক করে তোলার

জন্য দায়ী। সেখানে আধুনিক বিশ্বে দেশের স্বাধীনতার চেয়ে মানুষের স্বাধীনতাই সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা যেখানে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়, সেখানে মানুষের মানবিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে। একুশ শতকেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ। ২০২১-এর ১৫ আগস্ট ভারত যখন তার স্বাধীনতার গৌরবময় ৭৫ বছর পালনে শামিল হয়েছিল, সেদিনই তার প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান তালিবানের অধীনে চলে আসে। শুরু হয় স্বাধীনতার পাশাপাশি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার মরিয়া প্রয়াস, দেশান্তরি হয়ে বাঁচার আপ্রাণ আহ্বান। তালিবানের উগ্র ধর্মান্ধতায় আফগানিস্তানের ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। তাতে স্বাভাবিক ভাবে তালিবানের পক্ষে কী করে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে সরকারি তিন লক্ষ সৈন্যকে প্রায় বিনা যুদ্ধে কাবুল দখল করা সম্ভব হলো, তা নিয়ে চর্চা হচ্ছে। সেখানে আফগানিস্তানের অধিবাসীদের সমর্থন ব্যতীত তা যে সম্ভব হয়নি, তাও অনুমেয়। উঠে এসেছে আফগানিস্তানের সরকারের দুর্নীতি এবং সৈন্যদের ঠিক মতো বেতন না পাওয়ার কথা, রাষ্ট্রপতির স্বদেশের প্রতি টানের অভাব।

অন্যদিকে, সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেদেশ থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়া। যেন সে-দেশেরই সব দায়, সে দেশকে তালিবানমুক্ত রাখা। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সমর্থন, চীনের হাতছানি এবং ভারতের অসহায়তাবোধ নিয়ে চর্চার বহুমাত্রিক প্রকাশে গণমাধ্যমও সরব হয়ে ওঠে। সেখানে অবস্থানে মুসলমানদের নীরবতাবোধে অমুসলমানদের মেরুকরণও উঠে এসেছে। যে সাম্প্রদায়িকতায় ভারত ভাগ হয়েছিল, তার পরিচয়ও এখানে মেলে। বিশেষ করে তালিবানি শাসনে নারীদের উপরে ভয়ংকর বর্বরোচিত অত্যাচারের কথা ছড়িয়ে পড়ে। এখন তো শিল্পীদের উপরে নির্মম অত্যাচার নেমে এসেছে। সেক্ষেত্রে যেভাবে তালিবানদের ক্ষমতায়ন নিয়ে চর্চার পরিসর জমে ওঠে, সেভাবে স্বদেশে পরবাসীদের নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতিও নিজের দেশের নাগরিককে আঘাত করলে সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রত্যাঘাতের হুমকি দিয়েছেন। অথচ কোনো দেশই সে দেশের স্বদেশে পরবাসীদের নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতিও নিজের দেশের নাগরিককেই আঘাত করলে সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রত্যাঘাতের হুমকি দিয়েছেন। অথচ কোনো দেশেই সে দেশের স্বদেশে পরবাসীদের জীবনরক্ষায় এগিয়ে আসা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

অন্যদিকে, পরের বছর ২০২২-এর জুলাই-এ শ্রীলঙ্কায় তীব্র জনরোষে সে দেশের সরকারের পতন হয়, ১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করেন। সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণ বিদ্রোহ করে, প্রকাশ্য রাস্তায় সরকারি জনপ্রতিনিধিদের নিগ্রহ করে বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে দেয়, সরকারি সম্পত্তি লুট করে। দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি জনরোষের আগুন কতটা ভয়ংকর রূপ নিতে পারে, তার বাস্তব নিদর্শনে শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্তটি জনপ্রিয় উদাহরণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সামনে রেখে সে দেশের সরকার উৎখাতের আয়োজনের মধ্যেও তার কথা সমাজমাধ্যমের নানাভাবে উঠে আসে। ৫ আগস্ট (২০২৪) জনরোষের চাপে পড়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে দেশছাড়ার পর স্বাধীনতার নামে জনগণের সরকারি সম্পত্তির লুটতরাজ, বিধ্বংসী তাণ্ডব, আন্দোলন বিরোধীদের শত্রু ভেবে ধনসম্পত্তি লুট, অগ্নিসংযোগ, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, নৃশংসতা চরম আকার ধারণ করে। সেখানে স্বাধীনতার বিকৃত উল্লাসের আড়ালে দেশের মানুষের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়।

যেখানে আধুনিক বিশ্বে শক্তিশালী দেশের অভাব নেই, অথচ সেখানেই ধর্মান্ধ অমানবিক গোষ্ঠীর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তির বড়ো অভাব। আসলে ক্ষমতাই যেখানে শেষ কথা, সেখানে অক্ষমদের কথা কে ভাবে। স্বাধীনতা তো পালনের নয়, লালনের; উদ্‌যাপনে নয়, যাপনের; মান্যতায় নয়, মননের। চেতনাহীনের কাছে গোলামি করে সুখে থাকাও স্বাধীনতা মনে হয়। সেই যাপনের স্বাধীনতাকে আপন করার জন্যই তো মানুষ দেশকে বুকে নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে অচেনা পথেই চলতে শুরু করে। সে পথ যত দূরেরই হোক, যত দুর্গমই হয়ে উঠুক, তবু তা হাতছানি দেয় শরণার্থীকে। সেখানে যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার স্বাধীনতা থাকে। সেই স্বদেশে পরবাসী স্বাধীনতাকামীদের কথা যে আধুনিক বিশ্ব এখনও ভেবে উঠতে পারেনি, তা তালিবানদের উত্থানে আরও প্রকট হয়ে ওঠে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সেই ধারা অব্যাহত।

সেখানে যুদ্ধ একসময় নীরব হয়ে যায়, কিন্তু তার রেশ থেকে যায় স্বদেশে পরবাসীদের মনে আজীবন। বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতি। সেখানে যেমন স্বাধীনতার উন্মাদনায় যুদ্ধকে গৌরবান্বিত করা হয়, তেমনই অসংখ্য মানুষকে স্বদেশেই পরাধীন হয়ে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। উগ্র জাতীয়তাবোধে যুদ্ধের গৌরব যত সৌরভ ছড়ায়, ততই দেশের ছিন্নমূল শরণার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়। বিশ্বজুড়ে শরণার্থীদের প্রকট উপস্থিতিই বলে দেয় যুদ্ধ মানুষকে কত ভয়ংকর জীবনযুদ্ধে শামিল করতে পারে। সেখানে স্বদেশে পরবাসীদের ট্রাজিক পরিণতি আরও দুর্বিষহ, আরও মর্মান্তিক। যেখানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের অনেক মানুষের মনে স্বাধীনতা দিবসেই পরাধীনতার আত্মগ্লানি জেগে ওঠে, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি নতুন করে স্বাধীনতা লাভের আলোয় অসংখ্য মানুষের দেশান্তরে শরণার্থী হওয়ার শোচনীয় পরিণতিতে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে। সেদিন থেকেই তাদের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার দিন, ছিন্নমূল হয়ে স্বদেশ খুঁজে চলার অবিরাম পথচলার সূচনা, স্বদেশকে বুকে আগলে অস্তিত্ব সংকটের দুঃস্বপ্ন তাড়িত আতঙ্কিত জীবনের কালরাত্রি। সেক্ষেত্রে কারও স্বাধীনতাই কারও পরাধীনতা, কারও নিরন্তর দেশ খুঁজে চলা, ভাবা যায়! সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পুনরায় স্বাধীনতার লাভের ফলে ছিন্নমূল মানুষের দেশত্যাগের আবহে এস ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ'-এর সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তিই যেন আপন মনেই কথা বলে ওঠে 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

(লেখক প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া)

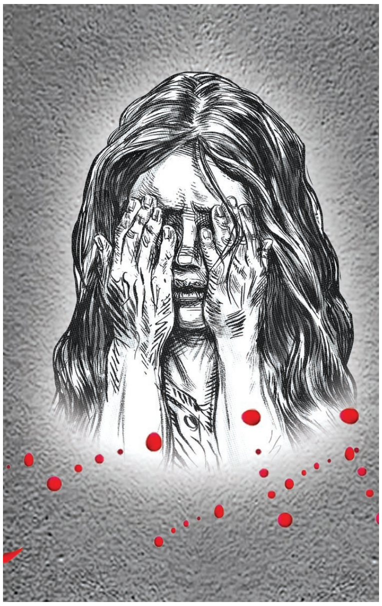

মা-বোনেরা কি আদৌ সুরক্ষিত আজকের পশ্চিমবঙ্গে ?

দিগন্ত চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তথা মা-বোনেরা কি আদৌ সুরক্ষিত? পাড়ার চায়ের দোকান হোক কিংবা বাস, ট্রেন এটাই এখন আলোচনার বিষয়। বিষয়টি এখন সাধারণ মানুষের কাছে উদ্বেগের বিষয়। ঘরের ছেলে- মেয়ে নিরারদে ঘরে ফিরবে কিনা এই নিশ্চয়তা পশ্চিমবঙ্গের মা-বাবাদের কাছে নেই বললেই চলে। থাকলেও, একের পর এক যা ঘটনা ঘটে চলেছে তাদের সেই আশা ক্রমশই ক্ষীণ হতে চলেছে বললে খুব একটা ভুল হবে না।

ঠিক এক বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে জীবনদীপ নিভে যাওয়া ছেলেটির পরিবার আজও নিজেদের সামাল দিয়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষও আশা করি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়নি ছেলেটিকে। মিছিল, আন্দোলন, অবরোধ অনেক কিছুই হয়েছিল সেই সময়ে, কিন্তু এতকিছুর পরও কাজের কাজ যে কিছুই হয়নি তা আবারও স্পষ্ট। তাইতো রাজ্যের প্রশাসন রয়েছে নিজের তালেই। কোনোকিছুতেই তাদের যেন কিছু এসে যায় না, আর এসে যাবেই-বা কেন? বাংলায় একটা প্রবাদ আছে ‘পরের ছেলে পরমানন্দ’, রাজ্যবাসীর প্রতি প্রশাসনের মনোভাবও খানিকটা এরকমই।

একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট নেতাদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে নারীদের সম্মান। সামনে এসেছে সন্দেশখালি, চোপড়ার মতো অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি। অপরদিকে দেখতে পাচ্ছি, রাজ্যের নামকরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঘন্য ঘটনাগুলি। অবাককাণ্ড, সবই কিন্তু ঘটছে যখন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। এরকমই আরও এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী থাকল রাজ্যবাসী। আবারও এক মা-বাবার কোল খালি হলো।

আরজিকর হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে মহিলা চিকিৎসকের অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে অত্যাচার, ধর্ষণ, হত্যার ইঙ্গিত স্পষ্ট। একের পর এক নারকীয় ঘটনার তালিকা ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ হচ্ছে। না, পুলিশ আজও কোনো কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে না, যদি নিত তাহলে অপরাধীরা এরকম ঘৃণ্য কাজ করার আগে নিশ্চয়ই দু’বার ভাবত। আমরা দেখেছি অন্য রাজ্যে এরকম ঘটনা ঘটলে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা। দেখেছি তিনি কীভাবে অতি দ্রুততার সঙ্গে

প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। আবার একইভাবে দেখেছি এই রাজ্যের ঘটনায় কীভাবে তিনি মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছেন। বেশিরভাগ সময়ে, কিংবা যার সঙ্গে এই জঘন্য কাণ্ড ঘটে তার ওপর প্রশ্ন তুলে, তাকেই দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কখনো আবার ধর্ষণের প্রমাণ চেয়ে কলঙ্কিত করেছেন সমগ্র নারী সমাজকেই।

আমরা যদি একটু তথ্যের দিকে নজর দিই তাহলে দেখব, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের ওপর ঘটে যাওয়া অপরাধ কিন্তু কমেনি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালে মহিলা ঘটিত অপরাধের ঘটনা ঘটেছে যাথাক্রমে ৩৬৪৩৯টি, ৩৫৮৮৪টি ও ৩৪৭৩৮টি। বিগত কয়েক বছরের তথ্য বেশ উদ্বেগেরই বটে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য আরও বলছে যে, ২০২০ সালে এ রাজ্যে শুধুমাত্র ধর্ষণের অভিযোগই এসেছে ১১২৮টি। প্রতি এক লক্ষ জনের মধ্যে ২.৪ জনকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়, পরিসংখ্যান অন্তত সেটাই বলছে। আবার ২০১৩ সালে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিবিসি বাংলা এক রিপোর্টে লিখেছে, ভারতে মহিলাদের ওপরে অপরাধের যত ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে ১৩ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গে। অর্থাৎ বিগত ১০-১২ বছর যদি আমরা দেখি ধারাবাহিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে নারীদের উপর জঘন্যতম অপরাধ ঘটেই চলেছে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, উপরে যে সব পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো, তার সবই কিন্তু পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে। যে রাজ্যে হাসপাতালের মধ্যে একজন ডাক্তারকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়, সেই রাজ্যে মা-বোনদের উপর হওয়া সব অভিযোগ যে থানায় পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত রয়েছে তা যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে তা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই না।

আদতে মহিলাদের ওপরে অপরাধের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে তার থেকেও অনেক বেশি সংখ্যায় মহিলারা নির্যাতিতা, ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আমরা যদি একটু ফিরে তাকাই তাহলে বুঝতে পারব কীভাবে এই ঘটনায় দোষীরা প্রশাসনের মদত পাচ্ছে। ২০১৩ সালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কামদুনিতে অপরহরণ করা হয় দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ ছাত্রীকে। সাত-আট জন মিলে তাকে নৃশংসভাবে গণধর্ষণের পর হত্যা করে। রাজ্যের শাসক দল প্রথমেই ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ফলে তা পারেননি। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোষীরা সেরকম কোনো কঠোর শাস্তি পায়নি। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণার পরও সেই শাস্তি খারিজ করে দেওয়া হয়।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গাড়ির ভিতরে এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। সারা রাজ্য তোলপাড় হয়ে যায় এই ঘটনায়। কিন্তু রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এক অদ্ভুত বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই সময়ে। তিনি বলেছিলেন এটা নাকি 'ছোটো ঘটনা'। যে রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষণকে 'ছোটো ঘটনা' বলে দোষীদের আড়াল করেন সে রাজ্যে তো অপরাধীদের 'নিরাপদ স্থান' হবেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিজলী জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে লিখেছিলেন,

'আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

শুধুমাত্র স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়েই নয়, রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আজও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেই কাঁদে। আজও উপযুক্ত বিচার পায়নি কামদুনি, পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষিতারা। বিচার পায়নি এরকম আরও অনেকেই যাদের ঘটনাকে হয়তো প্রকাশ্যেই আসতে দেওয়া হয়নি, রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালেই। তাই একটা প্রশ্ন বারবার তুলতেই হয়, পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেরা কি আদৌ সুরক্ষিত?

স্বামীজী বলছেন, 'মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড়ো হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখনো বড়ো হইতে পারে নাই, কস্মিকালে পারিবেও না।' যে স্বামী বিবেকানন্দ মা-বোনেদের দেবীর আদলে দেখতেন, সেই স্বামীজীর পশ্চিমবঙ্গেই এই অধঃপতন প্রশাসনিক কর্তাদের হৃদয়কে কি একটুও বেদনার্ত করে না?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মা-বোনেদের উপর ঘটে চলা এই লজ্জাকর জঘন্য ঘটনা নিয়ে কেউ কোনো রাজনীতি চায় না, চায় না ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতিও। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চায় মা-বোনেরা সুরক্ষিত থাকুক এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। তারা চায় নির্যাতিতারা যেন সঠিক বিচার পান। □

পোষা কালসাপের সহস্র ছোবলে দেশান্তরি হাসিনা

যন্ত্রণায় কাতর বাংলাদেশ

সাধন কুমার পাল

গত ৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিলেন সেখানকার নাগরিক সমাজ। সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাইকে আহ্বান জানানো হয়েছিল এই মিছিলে যোগদানের জন্য। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর আগে দেখা গেল সেই জমায়েত স্থান পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। মিছিলে যোগদানের উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আসছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। পুলিশের বক্তব্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা, বাংলাদেশিদের জন্য কোনোরকম বিক্ষোভ মিছিল বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজ শীতঘুমে থাকলেও এই মিছিল করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অনেকেই। তাঁর মধ্যে একজন শিক্ষক সমুহ কর্মকার ফেসবুক পোস্টে লিখলেন, 'যাক, গ্রেপ্তার বরণ করে কিছুটা হলেও শান্তি পেলাম'।

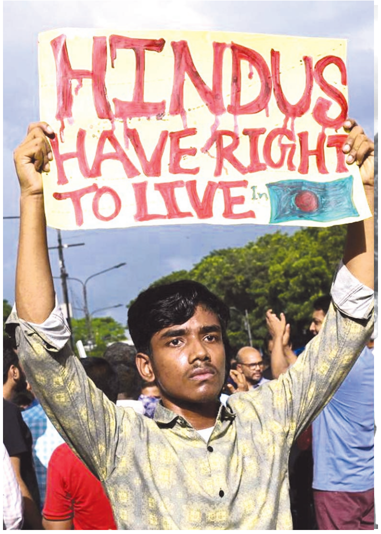

বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষোভ সর্বত্র। ওই দেশে অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন আছেন তারা চরম অমানবিকতার শিকার হচ্ছেন, অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। মিডিয়ায় বাংলাদেশের গণভবনের লুটের দৃশ্য দেখে অনেকের মনে ২০২১ সালের পোস্ট পোল ভায়োলেন্সের লুটপাটের অসহনীয় যন্ত্রণার দৃশ্য ভেসে উঠেছে। সেজন্য বাংলাদেশের ঘটনার জেরে পশ্চিমবঙ্গেরও আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করলে হয়তো সেই ক্ষোভের কিছুটা হলেও বহিঃপ্রকাশ ঘটে অনেক মানুষই একটু হালকা অনুভব করতেন। কিন্তু না, এ রাজ্যে প্যালেস্তাইন নিয়ে মিছিল করা যাবে, গাজা নিয়ে মিছিল করা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু হত্যা নিয়ে মিছিল করা যাবে না। এর থেকে মনে হয় জামাতের সেই স্লোগান 'বাংলাদেশ ট্রেলার হ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ মেঁ ফাইনাল বাকি হ্যায়' সত্যি হতে বোধহয় খুব বেশি দিন লাগবে না।

গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে তালিবানি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাসিনা সরকারের পতন ঘটানোর পর বাংলাদেশের স্রষ্টা মুজিবুর রহমানের মূর্তিগুলোও ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হলো। সেই সঙ্গেই ঘটেছে নির্বিচার হিন্দু হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, খুন, ধর্ষণ, মন্দির ভাঙার ঘটনা। ১৯৭১ সালেও বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান একই দৃশ্য দেখেছে। সে সময় পাকিস্তানের খান সেনা হিন্দুদের উপর নারকীয় হত্যালীলা চালিয়ে ছিল। পাকিস্তানি শাসকদের বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠা মুসলমানরাও সেই হত্যালীলার শিকার হয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলা ভাষার দাবি তুলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশের ভিত্তি। এর মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে আশি অতিক্রান্ত এই প্রৌঢ়কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে, তিনি কি শুধু হিন্দুর জন্য সেই লড়াইয়ে নেমেছিলেন? মাদারীপুর সরকারি কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সনাতন ধর্মাবলম্বী দীপ্ত দে ২০২৪-এর এই তথাকথিত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিকের শহীদদের মধ্যে একজন। হুতাত্মাদের মন্দির ভেঙে তাদের বাড়িঘর লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে এই হিন্দু হুতাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে বাংলাদেশের ধর্মান্ধ উন্মাদরা।

বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মতো তালিবানি দেশে পরিণত করার জন্য কয়েকটি তারিখ ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। যেমন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ যেদিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছিল, ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিনটি এবং ৪ নভেম্বর ১৯৭২, যেদিন বাংলাদেশে এক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রবর্তন হয়েছিল। ইতিহাস থেকে এই তারিখগুলি মুছে দেওয়ার জন্যই আওয়ামি লিগ জামানার অবসানের মতো একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে ভেঙে ফেলা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্মদাতা মুজিবুর রহমানের মূর্তিগুলো। যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল সেই বাংলা ভাষার একমাত্র নোবেল বিজেতা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্মারক, সংসদ ভবন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিচরিত ধানমণ্ডির বাড়ি, বিভিন্ন গ্রন্থাগার অর্থাৎ স্বাধীনতার বার্তা বহনকারী সমস্ত কিছুই মুছে ফেলা হচ্ছে বাংলাদেশের বুক থেকে। হিন্দুরা দলে দলে আশ্রয় নিচ্ছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে। কাতর আবেদন জানাচ্ছে বিএসএফের কাছে।

কোচবিহার জেলার শীতলকুচির পাঠানটুলি সীমান্ত গ্রামের কাঁটাতারের ওপারে ও জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ির সীমান্তে বাংলাদেশি হিন্দুদের চিৎকার করে বলতে শোনা গেছে 'হয় ভারতে ঢুকতে দিন না হলে আমাদের গুলি করে মেরে ফেলুন'। একাত্তরে ভারত সীমান্ত খুলে দিয়ে আশ্রয় প্রার্থীদের সবাইকে আশ্রয় প্রার্থীদের সবাইকে আশ্রয় দিয়েছিল। এখন কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এখন ভারত শরণার্থী হিসেবে এদের স্বীকার করছে না। ফলে এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের জিহাদিদের হাতে অসহায় মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। যে আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো ভারতে ছোটোখাটো সমস্যা হলে বড়ো প্রতিক্রিয়া দেয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, ইসলামি দেশগুলোর

সংগঠন যারা কাশ্মীর নিয়ে অতি সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দিতে থাকে, তারা সবাই কিন্তু আজকে নিশ্চুপ। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নারকীয় অত্যাচার নিয়ে কেউ একটি বাক্য ব্যয় করছে না।

বাংলাদেশের জেল ভেঙে কয়েদিরা পালিয়ে যাচ্ছে। পালানো কয়েদিদের মধ্যে রয়েছে আনসারুল বাংলা ও জামাতুল মুজাহিদিনের বাছা বাছা কুড়িজন আন্তর্জাতিক মানের সন্ত্রাসবাদী। যারা কিনা ভারত- বাংলাদেশ সবার জন্যই এক মূর্তিমান বিপদ। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এইসব কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীরা জেল ভেঙে পালানোর পর যথারীতি সীমান্ত টপকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা সবচাইতে নিরাপদ জায়গা বলে মনে করে আসছে।

বাংলাদেশ থেকে এমন সব ভয়ংকর ভিডিয়ো আসছে যেগুলো সবার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় আক্রমণ করা হয়েছে, জীবন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে পুলিশ কর্মীদের। পুলিশ কর্মীদের দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে জনবহুল এলাকায় ওভার ব্রিজের নীচে। শোনা যাচ্ছে এক হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মীকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশের কোনো থানায় এখন কোনো পুলিশ কর্মী নেই। সবাই থানা ছেড়ে পালিয়েছে। সেনাবাহিনীও নিষ্ক্রিয়। বিজয় উৎসব পালনে ব্যস্ত। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি হোটেলেও বহু মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে এক চরম অরাজক পরিস্থিতি। থানাহীন, প্রশাসনহীন বাংলাদেশে মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে এত বড়ো ঘটনা ঘটলো কেন বা কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকেই বিদেশের হাত দেখতে পাচ্ছেন। কেউ বলছেন এর পেছনে আমেরিকার হয়েছে, কেউ বলছেন চীন, পাকিস্তান লবি রয়েছে। এরকম বিভিন্ন বক্তব্য বা আন্দাজ উঠে আসছে। তবে কোটা সংস্কার নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার উদ্দেশ্য যে আরও অনেক বড়ো ছিল তা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে।

শেখ হাসিনার বিগত ১৬ বছর শাসনকালে ধীরে ধীরে আজকের এই অরাজক পরিস্থিতির পটভূমি তৈরি হচ্ছিল, যার জন্য বিদেশি শক্তির অঙ্গুলিহেলনে বাংলাদেশে এত বড়ো একটি ঘটনা ঘটে গেল। শেখ হাসিনা হেফাজতে ইসলামির মতো কট্টর ধর্মান্ধগোষ্ঠীকে বিপুল পরিমাণ জমি ও অর্থ দান করে ব্যাঙের ছাতার মতো মসজিদ-মাদ্রাসা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। এই মাদ্রাসায় শুধুমাত্র কোরান ও ধর্মান্ধতার পাঠ নিয়ে বেড়ে উঠছে হাজার হাজার ধর্মান্ধ বাংলাদেশি। হেফাজতে ইসলামকে খুশি করতে শেখ হাসিনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ করে ইসলামিক শিক্ষা চালু করতে সব রকম ভাবে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশে মসজিদ মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও নতুন নতুন মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে উঠতে সাহায্য করে হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন তিনি মদিনা সনদে দেশ চালাবেন এবং ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করবেন। এই হাসিনা জামানাতেই পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু লেখকদের লেখা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোল্লাবাদীদের খুশি করতে নিজের দলে স্থান করে দিয়েছেন ধর্মান্ধরা। নিজের দলে ওলামা আওয়ামি লিগ নামে একটি শাখা তৈরি করে সেখানে মোল্লাবাদীদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন। বাংলাদেশের জন্মের সর্বপ্রথম শেখ হাসিনা কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য করে 'কওমি মাতা' খেতাব উপহার পেয়েছিলেন। এই কওমি সন্তানেরাই এবার তার পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন।

জিহাদিরা যখন লালনের মূর্তি ভেঙেছিল তখন হাসিনা নিশ্চুপ ছিলেন। তারা যখন হিন্দুদের দুর্গা, কালী, সরস্বতী মূর্তি ভাঙতো হাসিনা কিছুই বলতেন না। ওরা যখন কুষ্টিয়ায় বাঘা যতীনের মূর্তি ভেঙেছিল, হাসিনা কিছু বলেননি। লেডি জাস্টিস-এর মূর্তি সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে সরানোর দাবিও হাসিনা মাথা নত করে মেনে নিয়েছিলেন। শুধু মোল্লাবাদীরাই নয় হাসিনার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষোভের কারণে আওয়ামি লিগ জামানায় প্রভাবশালীরা হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। কারণ পুলিশ লেলিয়ে, আর্মি নামিয়ে, নির্বিচারে গুলি চালিয়েও জনস্রোতকে ঠেকানো যাচ্ছিল না।

'৭২-এর ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। নারীর প্রগতির পক্ষে, নারীর সমান অধিকারের পক্ষে তিনি কোনো কাজ করেননি। নারী বিরোধী পারিবারিক আইন এবং উত্তরাধিকার আইন যেটি আজও ধর্মভিত্তিক সেটিকে সমান অধিকার ভিত্তিক করার কোনো উদ্যোগ নেননি। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি জারি করার চেষ্টা করেননি। তিনি সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বিদায় করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেননি, তার শাসনামলেও অমুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে নিগৃহীত হয়েছে লাগাতার। তার শাসনামলে একের পর এক মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী ব্লগাররা জিহাদির দ্বারা খুন হয়েছে। হাসিনা তাদের পক্ষে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি তিনি বরং ব্লগারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন, খুন হওয়ার জন্য তাদেরই দায়ী করেছেন। দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত কাজই হাসিনা করতে পারতেন। কারণ তিনি একসময় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন।

কিন্তু সেই পথে না হেঁটে তিনি বাংলাদেশের শত শত হিন্দু বিদ্বেষী, নারী বিদ্বেষী, ইহুদি-বিদ্বেষী ধর্ম ব্যবসায়ীকে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে কিশোর তরুণ-তরুণীদের মগজ ধোলাই করার অনুমতি দিয়েছেন। যারা দিনের পর দিন ধর্ম সমাবেশের নামে বাংলাদেশের তরুণ তরুণীদের মোল্লাবাদী দীক্ষা দিয়েছেন। বর্তমানে মূর্খ ও ধর্মান্ধ জিহাদিদের এই বাংলাদেশের সম্পদ, এই মৃত্যু উপত্যকাই এখন বাংলাদেশ। এই বীভৎস হত্যাকারীরাই এখন বাংলাদেশের সম্মাননীয় নাগরিক। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবন লুটপাট করে, বাংলাদেশ সংসদ ভবন লুঠপাট করে, মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডির বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে, শেখ হাসিনার অন্তর্বাস ঝুলিয়ে প্রকাশ্যে নারকীয় উচ্ছ্বাস করেও এই ধর্মান্ধরা দেওয়াল লিখন, বাদ যাচ্ছে না বেগম রোকেয়াও। আগামীদিনে বাংলাদেশের মসনদে ধুরন্ধর ধর্মান্ধ লোকেরা বসবে, দেশটিকে আফগানিস্তান বানিয়ে ছাড়বে। অবশ্য শুধু বাংলাদেশে কেন ভারতেও এমন অনেক অসভ্য বর্বর আছে যাদের কাছে আফগানিস্তান স্বর্গরাজ্যের সমান।

এপারে শ্যামাপ্রসাদের বঙ্গেতেও ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাসিনার মতোই ভয়ংকর রাজনীতি করে যাচ্ছেন। ৫ আগস্ট দেশ ছাড়ার মাত্র ছ'মাস আগে গত ৭ জানুয়ারি ২০২৪ 'অবাক' জয় পেয়েছিলেন হাসিনা। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল ৩০০ আসনের মধ্যে ২২৪টিতে জয় পেয়েছিল। মমতা ব্যানার্জিও হাসিনার মতো নির্বাচনের নামে প্রহসন করে বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। মমতাও বাংলাদেশের মতো 'জয় বাংলা', 'খেলা হবে' স্লোগানে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের মতোই ভয়ংকর পরিণতির আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। কারণ এ রাজ্যের পরিস্থিতিও অনেকটাই হাতের বাইরে। □

‘কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্’

বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভাগবত হলো পুরাণ শিরোমণি। সেখানে শ্রীবেদব্যাস লিখেছেন, ‘অবতারা হ্যসংখ্যেয়া’। অর্থাৎ অবতার অসংখ্য। ভাগবতে ২৪ অবতারের নাম পাওয়া যায়। কবি জয়দেব তাঁদের থেকে দশটি অবতারকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত ‘দশাবতার স্তোত্র’। শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসের সর্বশেষ আত্মতৃপ্তিদায়ক গ্রন্থ, যার বিষয়বস্তু হলো হরিভক্ত চরিত এবং শ্রীকৃষ্ণ চরিত। ভাগবতে দ্বাদশটি স্কন্ধ—তন্মধ্যে প্রথম ৯টি স্কন্ধ ভক্তচরিত। দশম স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত। শ্রীকৃষ্ণই ভাগবত রূপে পরিবর্তিত বা মূর্ত হয়েছেন। কলিতে জীবোদ্ধারের জন্য তাঁর দিব্য জন্ম-কর্মের বিস্তৃত ব্যাখা রয়েছে এই ভাগবতে। ভগবান গীতায়ও বলছেন, যখনই ধর্মের হানি হয় তখন ধর্মরক্ষার্থে অবতার রূপে আমি আবির্ভূত হই। যদিও তিনি নিজেকে ‘অজ’ বা জন্মরহিত বলেছেন, তথাপি লোককল্যাণে তাঁরই সৃষ্ট জগতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি মানবের সঙ্গে ক্রীড়া করেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে লীলা করেন। ভগবানের জন্ম ও কর্ম আমাদের প্রাকৃত জীবের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি গীতায় বলেছেন তাঁর জন্ম-কর্ম দিব্য। এই দিব্য শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর ভগবত্তার রহস্য। তিনি অযোনিসম্ভব। কিন্তু তাঁর প্রাকৃত জীবের মতো আপাতদৃষ্টিতে পিতা-মাতা ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁর স্বভাব এই নিজের ভগবত্তা ভুলে তিনি সকলের সঙ্গে একত্ব হয়ে লীলা করেন। তিনি নিজের ভগবত্তার আসন থেকে নেমে এসে আমাদের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। তিনি ভালোবাসার কাঙাল। তাঁর এই জন্ম ও কর্ম মানুষ যদি চর্চা করে অর্থাৎ যদি তাঁর নাম, রূপ, লীলা ও প্রেম নিয়ে কীর্তন করে তবে তাঁরা ত্রিবিধ দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে এক অপার্থিব প্রেমের অধিকারী হয়। তাই ভগবানের স্বমুখোক্তি, তাঁর দিব্য জন্ম-কর্ম তত্ত্বত জানতে পারলে সে ভগবানকেই পায়। আর সচ্চিদানন্দ মন ভগবানকে পেলে তার এই জগতে আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

‘জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।৪/৯

ভগবানের প্রধান দশ অবতারের ক্রমে রয়েছে—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এখানে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে ধরা হয়নি। কবি জয়দেব তার দশাবতার স্তোত্রে শেষের শ্লোকে বলছেন, ‘‘দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ’’। অর্থাৎ তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণ! তুমি ধরণীর ভার মোচনার্থে দুষ্ট দমন করতে বিবিধ (১০টি) রূপ নিয়েছ, সেই অবতার সমূহের মূল তুমি হলে অবতারী। অর্থাৎ তোমার থেকেই উক্ত সমস্ত অবতার উদ্ভূত হয়েছেন—সেই তোমায় প্রণাম জানাই। একটি প্রদীপ থেকে যেমন সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত করা যায়, তেমনি মূল ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর থেকেই সকল অবতারের উৎপত্তি। অবতার অনেক প্রকার। অংশ অবতার, আবেশ

ফ ঃ ৩

অবতার ও পূর্ণ অবতার। তবে, যে নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি ভগবান দেখি তাঁরা কী? তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি। ‘‘বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করেন অসুর সংহার।” অর্থাৎ অসুরাদি সংহার যখন করেন তিনি তখন তাঁর বিষ্ণু শক্তি সেই কাজ করেন।

আর একটি প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন পাঁচ হাজার বছর আগে ত্রেতাযুগে। তাঁর আগে তো রাম, পরশুরাম, বামনাদি অবতার এসেছিলেন—তবে শ্রীকৃষ্ণ তখন কোথায়? হ্যাঁ, ঠিক কথা, তবে শ্রীকৃষ্ণ তখনও ছিলেন—তিনি নিত্য, তাই তাঁদেরও অনেক আগে থেকে ছিলেন। তাঁর দুটি বাড়ি। একটি গোলোকে, অপরটি বৈকুণ্ঠে। গোলোকে তিনি মাধুর্যঘন বিগ্রহ। বৈকুণ্ঠে তিনি ঐশ্বর্যের কৃষ্ণ। গোলোকে তাঁর নিত্যস্থিতি। মাধুর্যের সখা-সখী, পিতা-মাতা নিয়ে আনন্দের রসাস্বাদনে থাকেন। তাঁর শক্তির চার ভাগের এক ভাগ মাত্র জগৎ পরিচালনায় ব্যয় হয়। বাকি তিনভাগ মাধুর্য, লীলা আচ্ছাদনে থাকেন নিত্য গোলোকে। গোলোকেরই প্রতিচ্ছবি আমরা মর্ত্যে পাই বৃন্দাবনে। আর বৈকুণ্ঠের প্রতিচ্ছবি পাই দ্বারকায়। গোলোকের নিত্য পিতা-মাতা, সখা-সখীরাই বৃন্দাবনে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করেন। নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধের পর প্রহ্লাদ তাঁর ভয়ংকর রূপ দেখে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। নৃসিংহদেব তখন প্লহ্লাদকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। প্রহ্লাদকে কোলে তুলতেই তাঁর হৃদয়ে বাৎসল্যরস উথলে উঠল। সুখোদয় হলো। ভাবলেন, আবার যখন অবতীর্ণ হবেন এইরকম নরশিশুর রূপ ধরে আসবেন। তাই তিনি পরবর্তী অবতার নিলেন অদিতি পুত্র বামনদেবের রূপ নিয়ে।

ভগবানের সঙ্গে আমরা পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ করে ভালোবাসতে পারি, আপন করে পেতে পারি। রামাবতারে এই পাঁচটি রসই তাঁর আস্বাদন হয়েছে। অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস তাঁর অশেষে বিশেষে আস্বাদন হয়েছে। সীতা তাঁর বিবাহিতা পত্নী। তাঁর সঙ্গে স্বকীয় মধুর লীলা আস্বাদনে তিনি তৃপ্ত। তাই তাঁকে রাবণ হরণ করে নিলে তিনি মর্মাহত হয়ে বনে বনে কাঁদতে কাঁদতে সীতাদেবীকে অন্বেষণ করেছেন। বনের মুনি-ঋষিগণ, স্বর্গের দেব-দেবীগণ সকলের প্রাণে ভগবান রামের পত্নীবিরহ দেখে মনে হলো, আমরা যদি ভগবানের পত্নী হতে পারতাম আমাদেরও তিনি সীতার মতো ভালোবাসতেন। আমরা সেই রকম ভাগ্যবতী হতাম। তখনই অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তাই পরবর্তী এমন একটি অবতারের প্রয়োজন হয়ে পড়ল, যাকে হতে হবে বহুবল্লভ। তাই শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি তাঁদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তাঁদেরকে ব্রজগোপীরূপে সৃষ্টি করলেন। সীতা-রামের প্রেমে একটি হেতু ছিল। কারণ উভয়ে ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং সমাজকে সাক্ষী রেখে পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁদের পরস্পরের ভালোবাসার পেছনে একটি দায়বদ্ধতা থেকে যায়। অর্থাৎ রাম সীতার প্রেমের উচ্ছলন বা পরম পরিতৃপ্ত পাননি। প্রেমে একটা হেতু আছে। ফলে সেই প্রেম নিখাদ বা অহৈতুকী প্রেম নয়। তাই প্রয়োজন হয়েছিল শ্রীরাধা ও ব্রজগোপীগণের সৃষ্টি, যাতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা না হয়েও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ-মন উজাড় করে গৃহ-সমাজ সব শৃঙ্খল ভেঙে ভালোবাসেন। তাঁদের এই ভালোবাসা জগতে অনন্য। তাই এই অহৈতুকী ভালোবাসায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে তাঁদের কাছে ঋণী করেন। এই ঋণ শোধের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের গৌর রূপে অবতার এবং শ্রীরাধা ও গোপীদের মনের ইচ্ছানুযায়ী প্রতি জীবের মধ্যে কৃষ্ণনাম প্রেমের প্রচার ব্রতই ছিল মহাপ্রভুর মূল লক্ষ্য।

শ্রীকৃষ্ণের ছিল ৬৪টি গুণ। যার মধ্যে ৫০টি গুণ মর্ত্যলোকে উন্নত সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বাকি ৫টি শিব ও ব্রহ্মার মধ্যে বিদ্যমান। আর ৫টি গুণ আছে তাঁর রামাবতার বা নারায়ণের মধ্যে। আর শেষ চারটি গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই নিজস্ব সম্পদ। সেগুলি হলো রূপমাধুর্য, লীলামাধুর্য, বংশীমাধুর্য ও প্রেমমাধুর্য। এগুলি দ্বারা তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন। এগুলি তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। তিনিই জীবের একমাত্র উপাস্য— যা প্রচার করতে তারই পরবর্তী অবতার মহাপ্রভুর অবতরণ। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর, জয়তু মহানামব্রতঃ। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ

কল্যাণ গৌতম

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।' মনস্তত্ত্ব বোধহয় এটাই, ভগবানের হাতে সুদর্শন না বাঁশি, সেটাই শাস্ত্রচর্চাকারীর ব্যবস্থা করতে হলে কোন পথে করতে হবে, জীবনযুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা আমার আছে কিনা, আপনাকে এবং আপনার পীড়িত ধর্মকে বাঁচানোর সাহস বিদ্যমান কিনা— এ সবই বোধহয় মূর্তিভাবনার ফল, সম্ভবত এক 'ইমিটেটিভ ম্যাজিক'। ভাবনাই যে ভক্তকে স্বনির্ভর করায়, ভাবনাই যে টিকে থাকতে প্রেরণা দেয়, তা মূর্তিভাবনা থেকেও পরিষ্কার! আর ভক্ত না থাকলে ভগবানই-বা কোথায়? আমাকে নিয়েই যদি প্রভুর এই মেলা, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর/তোমার প্রেম হতো যে মিছে।' তেমনই সাধুজনের জন্যই তাঁকে রাজা হয়ে নিত্য জেগে থাকতে হবে, রক্ষা করতে হবে। দেবতার অস্ত্রভাবনা তারই অনুষঙ্গে রচিত।

বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ, 'গাঁ নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়।' একটি পুকুরের মাছচাষ কীভাবে আগাছার দ্বারা ক্ষতি হয়, এ তারই নির্যাস। কিন্তু পুকুর কতখানি নষ্ট হলো? যতখানি গ্রাম নষ্ট হয়েছে কানাই বা কৃষ্ণের দ্বারা। হিন্দুর আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে এখানে সরাসরি এবং পরিষ্কার নষ্টলোক হিসেবে প্রতিপন্ন করা হলো। এখানেই আসল খেলাটা খেলে রেখেছে সেকুলার হিন্দু আর বিধর্মীদের হাতযশ। পরে দীর্ঘদিনের বামপন্থীদের প্রচেষ্টা তাতে আরও প্রবল ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে। কারণ যত যোদ্ধা-দেবতার চরিত্রকে কলুষিত করা যায়, ততই ধর্মান্তরণের কাজ হাসিল সহজতম হয়।

বলা হয়, প্রবাদ লোকসমাজের সৃষ্টি। অনেক সময়ই সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পাওয়া যায় না; যদিও প্রবাদ তৈরির প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা এবং প্রগল্পের ইতিহাসে তার উৎস ধরার চেষ্টা দেখা যায়। অনেক সময় অনেক সাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য কথা প্রবাদপ্রতিম বাক্য বলে স্বীকৃতি হয়। যেমন 'সে কহে অধিক মিছে/যে কহে বিস্তর।' অনেকসময় অনেক লোককবির কবিতা/ছড়ার উল্লেখযোগ্য বাক্য প্রবাদ রূপে আখ্যা পায়; সেখানে লোকসমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তির বিশেষ প্রবণতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজ করে। 'গাঁ নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়' এমনই একটি বাক্য, যা কৃষ্ণ-বিদ্বেষের বিষ হিসেবে থরে-বিথরে

প্রকাশিত। এখন এ কাজ কারা করলেন? এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে বরং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ থেকে কিছু উপযুক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

কৃষ্ণদ্বেষীদের কাছে যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক রূপে প্রচলিত, তা হলো কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধের কথা। বঙ্কিম লিখছেন, 'মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্বে শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারত প্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না— তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।'

এখন দেখা যাক কৃষ্ণচরিত্রের প্রামাণ্য দিকটি কোথায় কোথায় আছে? ব্রহ্মপুরাণের পূর্বভাগে আছে, বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমদ্‌ভগবতে দশম ও একাদশ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের তৃতীয় খণ্ডে আছে এবং পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও কূর্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইসব পুরাণগুলিই মহাভারতের পর লেখা এবং এর অনেকগুলিই অধুনাতন বা অর্বাচীন বলে স্বীকৃত।

এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তা নতুন গ্রন্থ, প্রাচীন পুরাণ নয়। আর এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক স্রোত যেন টগবগিয়ে ফুটছে। বঙ্কিমচন্দ্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস প্রচার বিষয়ে লিখছেন, 'মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণ দেখিতে হয় এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও

তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নেই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।'

এখন দেখা যাক, কোন পুরাণ কখন রচিত। উইলসন সাহেবের মতে কোনো পুরাণই সহস্র বছরের বেশি প্রাচীন নয়। পুরাণের প্রণয়নকাল তিনি যেভাবে নিরূপণ করেছেন, তার সহায়তা যদি নিই, সেই মতানুসারে বিষ্ণুপুরাণ দশম শতাব্দীতে লিখিত; ভাগবত পুরাণ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত; পদ্মপুরাণ ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা; বামনপুরাণ বঙ্কিম যুগ থেকে ধরলে তিন-চারশো বছরের গ্রন্থ; কূর্মপুরাণও প্রাচীন নয়; বায়ুপুরাণের সময় নিরূপিত না হলেও প্রাচীন বলে লিখিত। এখন ভারতবর্ষে এই সময় কারা শাসন ক্ষমতায় ছিল, তার সুলুকসন্ধান জরুরি। আরও সুলুকসন্ধান জরুরি এর মধ্যেও কালে কালে নানান প্রক্ষেপণ এসেছে কিনা, কোন শাসনকালে এবং কার বা কাদের দ্বারা।

দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ সম্পর্কে যত নষ্টামির কথা লেখা হচ্ছে তা সবই ভারতবর্ষে একটি বিশেষ ধর্মীয় শাসনকালে সংগঠিত হয়েছে। হিন্দু বিরোধী বিদেশি শাসক, যারা বিধর্মীদের উপর শাসনকার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারও চেয়েছিল, তারা হিন্দু সভাসদ পণ্ডিত ব্যক্তিকে কি ততখানিই পৃষ্ঠপোষণ করবেন না, যতটা তাদের ধর্মপ্রচার ও নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়? কানাইকে নষ্টচরিত্র করে তুলতে গল্পগাছা বানিয়ে রাজানুগ্রহ পাওয়ার ইতিহাস কি একেবারেই কষ্টকল্পনা! মধ্যযুগে বঙ্গের বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারায় যে সমস্ত কবি বিকশিত হয়েছেন তাদের সম্পর্কে তন্বিষ্ঠ পাঠও এক্ষেত্রে জরুরি বলে মনে হয়। তার সঙ্গে সংযুক্ত করাতে হবে তখনকার ধর্মীয় উন্মাদনার সত্যিকারের ইতিহাস। তারপর মিলিয়ে নেওয়া উচিত 'গাঁ নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়'— এই প্রবাদ কবে কোথায় কীভাবে পরিপুষ্টি লাভ করল! সব শেয়ালের এক রা— সবাই উচ্চৈঃস্বরে সমস্বরে করে এসেছে কিনা। বুঝে নেবার দরকার আছে, আমার কৃষ্ণ সত্যিই লম্পট কিনা।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, 'মহাভারতে কেবল ওই সভাপর্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দটা আছে... বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা-যুবতী-বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং যমলার্জ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীরা রোদন করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন কিছুই বোঝায় না।'

'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে এক আদর্শ ভারতীয় নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে হিন্দুদের দেবতা ভগবান কৃষ্ণকে এক কামুক, বহুগামী পুরুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে হিন্দুরা তখন বিভ্রান্ত। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের যোদ্ধরূপ, সাংগঠনিক ক্ষমতার কথা ভুলে গেছে বাঙ্গালি। এমতাবস্থায় সংগঠক কৃষ্ণের উপস্থাপনের প্রয়োজনের কথা ভাবলেন বঙ্কিম। পদানত ভারতবাসীকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে মাঠে নামলেন। 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' তারই অনবদ্য ফলশ্রুতি।

১৮৮৪ সালে 'কৃষ্ণচরিত্র' লেখা শুরু করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখন তাঁর বয়স ৪৬। এরপর আর মাত্র ১০ বছর জীবিত ছিলেন তিনি (তাঁর মৃত্যু ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল)। এরই মধ্যে তাঁর অধিকাংশ কালজয়ী সাহিত্যকর্ম রচনা শেষ হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে 'আনন্দ মঠ', 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি উপন্যাস। সম্পাদক বঙ্কিম হিসেবেও কাজ সেরে ফেলেছেন (১৮৭২ সালে তিনি সম্পাদনা করেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা)। সেখানে 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'সাম্য'-এর মতো লেখাও শেষ। এই বয়সে এসে তিনি হিন্দুধর্মের আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করলেন। ১৮৮৪ সালেই তিনি ধর্মতত্ত্বের প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে ১৮৮৫ সালে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য। সে বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। এমনই সময়কালের মধ্যে ১৮৮৬ সালে তিনি কৃষ্ণচরিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করছেন। আর 'প্রচার' পত্রিকায় লেখা শুরু করছেন শ্রীমদ্ভগবত গীতার বাংলা টীকা লেখার কাজ।

১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে 'প্রচার' পত্রিকায় কৃষ্ণচরিত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকল। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় অবধি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট 'কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ' শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে কৃষ্ণচরিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নবকলেবরের এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখলেন, 'কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তাছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকা ভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ।' □

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাঠাকুরানি

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরীয় লীলা বোঝা মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁর অপার লীলা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করেন। ভক্ত তাঁর কৃপায় ভক্তির অনন্য মহিমা ও তাঁর করুণা আস্বাদন করেন। শাস্ত্রে আছে, 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান'। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে আকর্ষণ করেন। যুগে যুগে তাঁর অপার লীলাকীর্তন কীর্তিত হয়েছে। দ্বাপর যুগে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন পূর্ণরূপে, ষোলোকলায়। ভগবানের লীলাসঙ্গিনী শ্রীরাধা। ভগবান কৃষ্ণ সঙ্গে শ্রীরাধা থাকায় তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই লীলারস পূর্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য ৫৩৭ বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব যিনি স্বয়ং 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণতনু'। যিনি বহিরঙ্গে কৃষ্ণ, অন্তরঙ্গে রাধা।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে শ্রীমতী রাধারানি হলেন আদিশক্তি। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ হলেন এক ও অভিন্ন সত্তা। শাস্ত্রকথা হলো—

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ।।

শ্রীরাধা হলেন পূর্ণ শক্তিমান। শক্তি থাকলে তবেই হয় শক্তিমান। চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।

তাই রাধা-কৃষ্ণ একাত্মা। দুই দেহ ধারণ করে অনন্য বিলাসরস আস্বাদন করেন। প্রশ্ন আসে, এই রাধারানি কে? তাঁর স্বরূপ কী? চৈতন্য চরিতামৃতাকার বলেছেন—

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরানি।।

দেখা যায় পুরাণ, বেদান্ত বা শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংস শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সরাসরি এই নাম নেননি। গোদুগ্ধের প্রতিটি বিন্দুতে যেমন ঘৃততত্ত্ব নিহিত, সেরকম শাস্ত্রকার ব্রজমহিমা বর্ণনা দিতে গিয়ে সমস্ত অংশ জুড়েই রাধামহিমা কীর্তিত। চিত্ত ভক্তির গঙ্গার স্রোত অবিরত ধাবমান। কতিপয় ভাগ্যবান তার আস্বাদন করেন।

রাধাঠাকুরানি কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ। কৃষ্ণপ্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী যেমন দেবী সরস্বতী, ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেমন দেবীলক্ষ্মী, সেরকম রাধাঠাকুরানী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে— 'ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ'। শক্তিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়— অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা।

অন্তরঙ্গার তিনটি ভাগ— সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। ক্রমান্বয়ে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ অর্থাৎ শ্বাশত, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান, আনন্দ অর্থাৎ হ্লাদিনী বা প্রেম বা ভক্তি।

হ্লাদিনী করায়ে কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী-রাধাকৃষ্ণ করে ভক্তের পোষণ।।

হ্লাদিনী আনন্দ আস্বাদন করেন কৃষ্ণ। তিনি ভক্তির পুষ্টি সাধন করেন। হ্লাদিনী সার হলো প্রেম, প্রেমের সার হলো ভাব এবং ভাবের সার হলো মহাভাব। মহাভাব স্বরূপিণী রাধারানি হলেন হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রতীক। চৈতন্য চরিতামৃতে পাই—

হ্লাদিনী সার প্রেম, প্রেম সার ভাব,
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম, মহাভাব।

আদিলীলা, চতুর্থ অধ্যায়

এখানে আরও বলা হয়েছে—

মহাভাব স্বরূপ শ্রীরাধাঠাকুরানি
সর্বগুণমণি কৃষ্ণ কান্তাশিরোমণি।।

এই প্রেম বিগ্রহের পূর্ণ আস্বাদন করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। যিনি অন্তরে রাধা, বাইরে কৃষ্ণ। একই অঙ্গে রাধাকৃষ্ণ। তাঁর প্রেমধারায় ঝরেছে প্রেমাশ্রু। ভক্তির বিগ্রহ তিনি স্বয়ং। উজাড় করে পাওয়ার জন্য তাঁর আত্মনিবেদন। দুই হাত তুলে সেই আত্মসমর্পণের ভাবকে ব্যক্ত করেন।

রাধাভাব হলো মহাভাব বা দিব্যভাব। আজকের দিনে বিভিন্ন ভাবে প্রদর্শন ও কূটতর্ক হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা দৃষ্টিভঙ্গী— 'যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।' চৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম।"

এটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের সার কথা। দেহকেন্দ্রিক সংকীর্ণতায় কামভাবে জর্জরিত তনু জীবনের মহৎ সত্যের আস্বাদন পায় না। পরম করুণাময়ী শ্রীরাধাভাব আস্বাদন করতে পরম দয়িত কৃষ্ণচরণে অঞ্জলি দিতে হবে। ■

অবতার শৈশবেও শক্তিশালী

দেবজিৎ সরকার

যুদ্ধে চক্রধরং বিষ্ণু'র মতো কথা প্রচলিত থাকতেও আমরা প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রচারই করেছি বেশি, তাই যুদ্ধ ভুলেছি। যদিও প্রেমের অসম্ভব শক্তি। তবে সে শক্তির স্থান-কাল-পাত্র আলাদা। প্রেমের সেই ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানও জড়িত। অবতারের শৈশবে অনবদ্য শক্তি থাকে। তাই কেবল নিশ্চিন্তে গোপালসেবা করলে আমরা বাৎসল্য বোধে বিশ্ব সংসারকে ভুলে যাই। সেই ভুলের মাশুল বড়ো কম নয়! ইদানীং সব যুদ্ধে হেরে ভূত হয়েছে বাঙ্গালি, এমনকী বঙ্গবোধেও। কৃষ্ণোপাসনায় তাই ভারতবোধ থেকে বঙ্গবোধ বিচ্ছিন্ন করা চলে না।

দেশকে জ্বালিয়ে দিতে উদ্যত এক ভয়ংকর শক্তি, তার সঙ্গে এই রাজ্য অধর্মের কলুষে নিমজ্জিত। এ এক রহস্যে ঘেরা বঙ্গের ধর্মচর্চা। বিভাজিত বঙ্গের হিন্দুর ঘরে ঘরে ধর্মচর্চার ঢাকঢোল, অথচ ধর্মরক্ষার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ঘরে ঘরে গুরু কৃপাহি কেবলম্। বাঙ্গালির ধর্মগুরুরা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে প্রতীতি জন্মানোর চেষ্টা করেছেন, শিখিয়েছেন— সর্ব ধর্ম সমান। বলেননি, ধর্ম আর 'রিলিজিয়ন' এক নয়। তারা বুঝিয়েছেন, ভারতীয় সমাজ ও তাঁদের আরাধ্য দেবতাদের সঙ্গে বহিরাগত আক্রমণকারীদের উপাস্যরাও সমান। সবাই একই রকমভাবে সমদয়াময়। প্রায় দু'শো বছর ধরে বাঙ্গালি ধর্মগুরুরা এক অদ্ভুত পাঁচন তাঁদের শিষ্যদের পরিবেশন করে আসছেন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ধারণা, সহজপাচ্য এই পাঁচন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ক্লীবত্বে ভরপুর, মেরুদণ্ডহীন, সেকুলার। কারও মতে ব্যালেন্সিং বজ্জাত তৈরির মহৌষধ।

হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী এই সর্বনাশা প্রবণতার কারণ কী ছিল তা কে জানে! কিন্তু অন্তত আটটি প্রজন্মে এই বিষ ভয়ানকভাবে ছড়িয়ে গেছে। তার মাশুলও গুনছে বাঙ্গালি। জন্মাষ্টমীতে বাঙ্গালি গোপাল পূজায় ব্যস্ত। ঘরে ঘরে আদুরে গোপাল হাতে আনন্দনাড়ু নিয়ে হামা দিচ্ছেন। নিজের গোপালও তাই। মৃন্ময় অথবা ধাতব মূর্তি ভাবে- অনুভবে ভক্তের কাছে চিন্ময় রূপ গ্রহণ করেছেন। চারবেলা সেবা নিচ্ছেন। কিন্তু ভক্ত কি তাঁর আদুরে গোপালকে হিন্দু হওয়ার দায়ে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের বিধর্মী নেতাদের ইচ্ছায় শয্যাসঙ্গিনী হওয়া বাড়ির মেয়েদের দুরবস্থার কথা বলতে পারছেন? লাভ জেহাদে বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ, তারপর বশ না মানা মেয়ের শরীরের অগুন্তি খুবলানোর দাগ। ভবপারে পাড়ি দেওয়া অভাগিনীর মৃত্যুমিছিল। কিন্তু জন্মাষ্টমীতে তালের বড়া খেয়ে গোপালভক্তরা কী প্রতিশোধ নিলেন? কেউ শুনতে পেয়েছেন? শোনেননি, কেউ শোনেন না, শুনবেনও না। কারণ গোপালভক্ত বাবাজী বা মাতাজীরা গোপালকে বড়োই হতে দেননি। কিন্তু এই নাড়ুগোপালই পুতনা বধ করেছিলেন। এই ছোট্ট কৃষ্ণই কালীয়নাগদমন করেছিলেন। অঘাসুর, বকাসুর, ধেনুকাসুর কত অসুরকে নিধন করেছিলেন। চক্রধারী কৃষ্ণ ধর্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর জীবনদর্শন বদলে দিয়েছিলেন।

আজ আবার সারা ভারত ধর্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ। বঙ্গ এক দুর্গন্ধময় অধর্মের পুরীষে পরিপূর্ণ। তাই হে সনাতনী সাধক, সাধারণ হিন্দু জনতা, এই জন্মাষ্টমী সনাতন সমাজকে জাগিয়ে তুলুক। হে সনাতনী বাঙ্গালি, আর সময় নেই। তোমার গোপাল এবার কৃষ্ণরূপে দেখা দিক। রাধিকারমণ বংশীধারী গোপিকামোহন হৃদয়হরণ রূপে নয়— অসুরনিধনকারী ধর্মরক্ষাকারী চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা ঘরে ঘরে শুরু হোক। ধর্মীয় আচারে বিভক্ত ও আবদ্ধ বাঙ্গালি হিন্দু পাঞ্চজন্যের আহ্বানে প্রখর হিন্দুত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠুক।

বাঙ্গালি মনে রাখুক, গত ৫০০ বছর ধরে সে প্রতি মুহূর্তে তার জননী, জায়া, জমি ও জীবন মরুদস্যুদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাই বাঙ্গালি, জাগো। চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করো।

১৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা রাতের দখল নিয়েছে শাঁখ বাজিয়ে। ব্রিগেডে লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠে বাঙ্গালি গেয়েছিল, 'হে পার্থসারথি/বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ/চিত্তের অবসাদ দূর করো, করো দূর/ভয়-ভীত জনে করো হে নিঃশঙ্ক।' আর আছেন বাঙ্গালির রবীন্দ্রনাথ, 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।'

যুদ্ধের এই শঙ্খ কেড়ে নিতে দেওয়া যায় না। প্রতিবাদের ভাষাতেও ওরা বাদ দিতে চাইছে। এই শঙ্খ কেড়ে নেওয়া আর শ্রীকৃষ্ণের যোদ্ধারূপ সরিয়ে দেওয়া একই ব্যাপার।

'তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে,/কেমন করে সইব।/ বাতাস আলো গেল মরে/এ কী রে দুর্দৈব।/লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,/গান আছে যার ওঠ-না গেয়ে...'। কলিযুগে যুদ্ধবিস্মৃত জাতির কোথাও ঠাঁই নেই। □

দেশবিদেশের ডাকটিকিটে শ্রীকৃষ্ণ

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় ডাকবিভাগ সাধারণ মানুষের মননে, চেতনে কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি করে ডাকটিকিটে বারবার শ্রীমধুসূদনকে ব্যবহার করেছে। ১৯৭৮ সালে 'শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা' শীর্ষক ডাকটিকিটে রথে সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়। পঁচিশ পয়সা দামের এই টিকিটে গীতার অমোঘ উপদেশ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' লেখা ছিল। ১৯৮২ সালে 'এশিয়ান গেমস' শীর্ষক ডাকটিকিটে লক্ষ্যভেদী অর্জুনকে তিরন্দাজি মুদ্রায় দেখা যায়। এই বর্ষেই ভারতের উৎসব শীর্ষক ডাকটিকিটে কালীয় দমনরত রাখালরাজাকে দেখা যায়। ২০০৬ সালের শিশু দিবসে কালীয় দমনরত বালক কানাই ডাকটিকিটে উঠে আসে। মহাভারত সংক্রান্ত ডাকটিকিট একাধিক বার ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রকাশ করেছে। ২০১৭-তে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধক্ষেত্রে পার্থের সম্মুখে নারায়ণের বিশালাকার বিশ্বরূপ ডাকটিকিটে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

সাধক কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যগ্রন্থে মানভঞ্জনের 'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্' পর্যন্ত লিখে আর লিখতে পারছিলেন না। তারপর 'রাধিকার চরণ শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে ধারণ করিলেন' এ কথা কেমন করে লিখবেন ভাবনায় কাতর হয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে করতে স্নান করতে গেলেন। স্বয়ং মধুসূদন ভক্তের সংকটমোচনে জয়দেবের রূপ ধারণ করে নিজ হাতে 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্' এই চরণ লিখে পদ মিলিয়ে দিলেন। ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই করুণা ২০০৮ সালে 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' নামের ডাকটিকিটে ফুটে ওঠে।

ভারত ছাড়াও হিন্দুপ্রধান দেশ নেপাল তাদের ডাকটিকিটে একাধিক বার মুরলীমনোহরকে বংশীধারী রূপে, শ্রীরাধিকার সঙ্গে লীলাক্ষেত্রে বিচরণরত। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মানচিত্রে বিরাজমান ইয়েমেন আরব রিপাবলিক ছিল এমন একটি দেশ যারা রাধামাধবকে রাধারানির সঙ্গে তাদের ডাকটিকিটে ফুটিয়ে তুলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময় জগতের পালনকর্তাকে তাদের দেশের ডাকটিকিটে স্থান দিয়েছে যা ব্রজক্ষেত্র ভারতবর্ষের সকলের হৃদয়কে প্রসন্ন করেছে।

জন্মাষ্টমীর ছাপ্পান্ন ভোগ

দিতি ভট্টাচার্য

মাতা যশোদার নয়নের মণি শ্রীকৃষ্ণ। তার কত না নাম, কত না পরিচয় আর কতই না রূপ। তিনি কখনো বন্ধু, কখনো সখা, আবার কখনো কারও প্রাণাধিক প্রিয় প্রেমিক। তাঁর জন্মতিথি জন্মাষ্টমী। পাপভার থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিতে ও সাধু-সন্ন্যাসীদের পরিত্রাণের জন্য মর্ত্যে আর্বিভাব বিষ্ণুর অষ্টম অবতার রূপে।

জন্মাষ্টমীর ভোগ, সে এক বিরাট আয়োজন। হবেই-বা না কেন, ভোগ তো এক-দু'টি নয়, পুরো ছাপান্ন। গোপালকে সন্তুষ্ট করতেই এত আয়োজন। এই ছাপান্ন ভোগেরও আছে এক মনকাড়া উপাখ্যান। গোকুলে নন্দলাল ও যশোদার ঘরে যখন গোপাল থাকতেন, দিনে আটবার তাঁকে খাওয়াতেন মা যশোদা। একবার অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রজে বিপুল বৃষ্টিপাত দেন। সেই প্রবল বৃষ্টির তোড়ে সবকিছু প্রায় ভেসে যায়, তখন গোবর্ধন পর্বত নিজের আঙুলের ডগায় তুলে রাখেন শিশু শ্রীকৃষ্ণ। বেগতিক দেখে দেবরাজ ইন্দ্র সরে দাঁড়ান তার মত থেকে, থামে বৃষ্টি। তখন গোপাল গোবর্ধন পর্বতকে যথাস্থানে রাখেন। এই সাত দিন তিনি এক ফোঁটা খাবার বা জল মুখে দেননি। তাঁর জন্য রক্ষা পায় পুরো গোকুল। দিনে আটবার করে খাওয়ার হিসেবে তাঁর জন্য ৫৬ রকম পদ তৈরি করেন গোকুলবাসী।

এই ৫৬ রকমের পদই ৫৬ ভোগ নামে পরিচিত হয়। ৫৬ ভোগে থাকে ২০ ধরনের মিষ্টি, ১৬ রকমের নোনতা খাবার এবং ২০ রকমের শুকনো ফল।

এগুলি হলো ১. ভাত (ভক্ত), ২. ডাল (সুপ), ৩. চাটনি (প্রলেহ), ৪. কঢ়ী (সদিকা), ৫. দই-সবজির কঢ়ী (দধিশাকজা), ৬. সিখরন (সিখরিণী), ৭. শরবত (অবলেহ), ৮. বাটী (বালকা), ৯. মোরব্বা (ঈক্ষু খেরিণী), ১০. শর্করা যুক্ত (ত্রিকোণ), ১১. বড়া (বটক), ১২. মঠরী (মধু শীর্ষক), ১৩. ফেনি (ফেণিকা), ১৪. পুরী বা লুচি (পরিষ্টশ্চ), ১৫. খজলা (শতপত্র), ১৬. ঘেওয়ার (সধিদ্রক), ১৭. মালপুয়া (চক্রাম), ১৮. চোলা (চিল্ডিকা), ১৯. জিলিপি (সুধাকুণ্ডলিকা), ২০. মেসু (ধৃতপূর), ২১. রসগোল্লা (বায়ুপূর), ২২. চন্দ্রকলা, ২৩. মহরায়তা (দই), ২৪. থুলি (স্থূলী), ২৫. লবঙ্গপুরী (কর্পূরনাড়ী), ২৬. খুরমা (খণ্ড মণ্ডল), ২৭. দালিয়া (গোধূম), ২৮. পরিখা, ২৯. সুফলঢয়া (মৌরী যুক্ত), ৩০. বিলসারু (দধিরূপ), ৩১. লাড্ডু (মোদক), ৩২. শাক, ৩৩. অধানৌ আচার (সৌধানা), ৩৪. মোঠ (মণ্ডকা), ৩৫. পায়েস (ক্ষীর), ৩৬. দই, ৩৭. গাওয়া ঘি, ৩৮. মাখন (হৈয়ঙ্গপীনম), ৩৯. মালাই (মণ্ডুরী), ৪০. রাবড়ি (কূপিকা), ৪১. পাপড় (পর্পট), ৪২. সীরা (শক্তিকা), ৪৩. লস্যি (লসিকা), ৪৪. সুবত, ৪৫. মোহন (সংঘায়), ৪৬. সুপুরি (সুফলা), ৪৭. এলাচ (সিতা), ৪৮. ফল, ৪৯. তাম্বুল, ৫০. মোহন ভোগ, ৫১. লবণ, ৫২. কষায়, ৫৩. মধুর, ৫৪. তিক্ত, ৫৫. কটু, ৫৬. অম্ল। এই ৫৬ ভোগ ৬টি রসের সাহায্যে ৬ ধরনের স্বাদ দেয়। ৫৬ ভোগে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন ও ভক্তদের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

রন্ধন পটিয়সী বাঙ্গালি মায়েরাই-বা কেন পিছিয়ে থাকবেন এই মহা আয়োজন ও তাদের প্রাণপ্রিয় গোপালের ভোগ নিবেদনে। তাঁরাও এই বঙ্গে জন্মাষ্টমীতে ঘরে ঘরে তৈরি করেন নানান পদ। জন্মষ্টমীতে ছাপ্পান্ন ভোগ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন দেওয়া হয়, তেমনি জগন্নাথদেবকেও নিবেদন করা হয়। কথিত, শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করতে এই ছাপ্পান্ন ভোগ নিবেদন করলে ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে থাকে। ◻

কারাগারেই যখন কৃষ্ণ আগলে রাখেন

কল্যাণ চক্রবর্তী

কারাগারে যেমন দুর্জন অপরাধীকে বন্দি করে রাখা হয়, তেমনই কখনো অপরাধী থাকেন বাইরে, আর কারাগারে বন্দি করে রাখা হয় সুজন-সম্পূর্ণকে। যুগে যুগেই এই দ্বিবিধ দৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে কারাগার এক দ্বৈত ক্রিয়াস্থলের নাম। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কারাগারের এক প্রাচীন যোগ আছে। তবে শ্রীকৃষ্ণের মতো নাম হলেই যে তিনি সুকৃতির কারা-বাসিন্দা হবেন, এমন কথা নেই। 'কানাছেলের নামও পদ্মলোচন' হয়। 'আসল' আর 'ভেজাল' বোধহয় মহামায়ার লীলা-সম্পুট।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কংসের কারাগারে। আর ইংরেজদের কারাগারে শ্রীঅরবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। কারাগারের নির্জনতায়, একাকিত্বে এবং অখণ্ড অবসরে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবোধনের যে সুযোগ ঘটে, তা অস্বীকার করেননি ভারতের রাষ্ট্রবাদী মানুষ। বহু বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তাঁদের কারাজীবনেই তৈরি করে ফেলেছিলেন দেশগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ভারতীয় দর্শনে এক অভূতপূর্ব স্থান দখল করে আছে কারাগার। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দের কারাজীবনে সংঘটিত সেই অপূর্ব ঐশী চেতনার কাহিনি স্মরণ করা যেতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ 'কারাকাহিনি' গ্রন্থে লিখলেন, "কারাবাসের পূর্বে আমার সকালে এক ঘণ্টা এবং সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোনো কার্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনো মতে দেড়ঘণ্টা-দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। ....এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশপথ নিরুদ্ধ; দুয়েকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। ....জেলের ঘরের সেই নির্জীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিস্ক পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। ....কাল যেন তাহার (বিদ্রোহী মন) উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তিরহিত। তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথম, কীরূপ মনের গতিতে নির্জন কারাবাসের কয়েদি উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে য়ুরোপীয় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন এবং যাহাতে আমার সাধ্যমতো আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি, তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন।

ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধহয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। ...তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্যে লাগানো আমার যোগলিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেদিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনাসকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময়

ফঃ ৪

শ্রীহরির আশ্চর্য আনন্দ মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।"

ক্রমে যোগাভ্যাস করে শ্রীঅরবিন্দ কারাজীবনে পেলেন এক পরমানন্দের সন্ধান। তখন আর মনে হতো না, কারার উচ্চ দেওয়ালে তিনি বন্দি। সর্বত্রই দেখতেন বাসুদেবের দিব্য উপস্থিতি। কয়েদিদের দেহের মধ্যে যেন পরিলক্ষিত হচ্ছিল ভগবান নারায়ণ। সাধুপুরুষ ও ছোটোলোকের মধ্যে ভেদ খুঁজে পেলেন না। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি বলছেন, "যে জেল আমাকে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেইদিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দি নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছেন। আমার পালঙ্কস্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপরে শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম—চোর, খুনি, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা এবং অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম।... ভাগবান আমাকে বললেন, দেখ, কীসব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে-জাতকে আমি তুলতে চাই, এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।"

পরিশেষে বলি, আসলে-নকলে জেলজীবনে নিত্য-নাটের খেলা। কেউ মতাদর্শের জন্য কঠিন কারাজীবন ভোগ করেছেন, কেউ চুরি, রাহাজানি, খুনজখম করে কারান্তরালে দিনগত পাপক্ষয় করছেন। কারাবাস কখনও কখনও সত্যবাদীকেও গ্রহণ করতে হয়, আদর্শবাদীর গন্তব্য হয়ে ওঠে কারাগার। মনুষ্যত্ব গঠন, উন্নয়ন-বিকাশের পুণ্য লড়াইয়ে জেল খাটিয়ে মারে অপশাসনের কালোহাত। সেই হাত, সেই প্রাচীর মনের জোরে ভেঙে ফেলার নামই 'কৃষ্ণাশিস'। এমন কারাগার জীবনের জয়গান গাওয়া রাষ্ট্রবাদীর আনন্দ নিকেতন হয়ে উঠেছে বারংবার।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বঙ্গপর্বের সময় গীতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধও রচনা করেন। তিনি তখন সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রকাশ করলেন 'গীতার ভূমিকা' সংক্রান্ত ধারাবাহিক কিছু লেখা। তা পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্টের তরফে ১৯২০ সালে। তখন তিনি পণ্ডিচেরীতে রয়েছেন।

বইটিতে তিনটি বিষয় পরিস্ফুট করেছেন শ্রীঅরবিন্দ— বক্তা, পাত্র ও অবস্থা। বক্তা হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কর্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী হিসেবে দেখিয়েছেন। শাস্ত্রে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী লীলা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সখা মহাবীর অর্জুন গীতারূপ জ্ঞানের পাত্র, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাই, প্রিয় সখা, পরম হিতৈষী বন্ধু ও ভগ্নিপতি। ভগবান তাঁকেই গীতার পরম রহস্যের অমৃতবাণী শোনাবার জন্য বরণ করে নিলেন। সখা ও সহায় যিনি, তারই কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করে যেন অর্জুন মানবজাতিকে তুলে দিলেন।

কুরুক্ষেত্র অতিভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রারম্ভ। কোন অবস্থায়, কোন পরিস্থিতিতে তা সংঘটিত হচ্ছে অর্জুনকে দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত-জ্ঞান প্রকাশ করলেন। স্থান যুদ্ধক্ষেত্র হলেও, মঞ্চ সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল হলেও, দেখা যাচ্ছে সেখানেই এর দীপ্ত কথাচারণা। ভগবান কী, জগৎ কী, সংসার কী, ধর্মপথ কী, গীতায় তার সকল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর। সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্মশিক্ষা হচ্ছে গীতার মূল উদ্দেশ্য।

গ্রন্থটির আলোচনায় আছে সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি, দুর্যোধনের বাক-কৌশল, পূর্ব সূচনা, বিষাদের মূল কারণ, বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ, বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ, বৈষ্ণবী মায়ার ক্ষুদ্রতা, কুলনাশের কথা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ, শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল। আলোচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, কৃপা ও দয়া, অর্জুনের শিক্ষাপ্রার্থনা, মৃত্যুর অসত্যতা, মাত্রা, সমভাব, সমতার গুণ এবং দুঃখজয় প্রসঙ্গ। রয়েছে গীতার ধ্যান, সন্ন্যাস ও ত্যাগ এবং বিশ্বরূপ দর্শন।

অরবিন্দ লিখছেন, "গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সর্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।" শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন দ্বাপর ও কলিযুগের সংযোগস্থলে।

চতুর্যুগের মধ্যে কলিযুগ নিকৃষ্ট, কারণ এই যুগ মানুষের উৎকর্ষতার প্রধান শত্রু পাপপ্রবর্তকের রাজ্যকাল। কলিযুগ অবনতি ও অধোগতির রাজত্বকাল। কলিযুগ উৎকৃষ্ট একারণেই যে, বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে, জীর্ণ পুরাতন ধ্বংস হয়ে নতুনের আবির্ভাব ঘটবে। কলিকাল তাই নতুনের কাল, নতুনের বীজ বপন ও অঙ্কুরোদগমের কাল। এই বীজ থেকেই মহীরূহ হয় সত্যযুগের বৃক্ষ। ঘোর অবনতির পরে উন্নতি। চক্রগতিতে সম্পন্ন হবে তা। আর সেই সঙ্গে ভগবানের আপন অভিসন্ধি সাধিত হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি। গীতার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগ আগমনের উপযোগী গুহ্যজ্ঞান ও কর্মপ্রণালী রেখে গেছেন। গীতার বাণী হলো সত্যযুগের মহালয়া। শ্রীঅরবিন্দ আশা প্রকাশ করেছেন, সত্যের আগমনকালে গীতাধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী। পণ্ডিতদের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হবে গীতার ভাব-অনুভব।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন, যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, যা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধি, মহাভারত রূপক নয়, কৃষ্ণ ও অর্জুনও কবির কল্পনা নয়। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, গীতাও আধুনিক তার্কিকের সিদ্ধান্ত নয়। তাঁর উপদেশ, সব কথা যে অসম্ভব নয়, যুক্তিবিরুদ্ধ নয়, তা প্রমাণ করতে হবে ভারতবাসীকে। ■

অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবসে ‘আগ্নেয় আগস্ট’ উদ্‌যাপন

গত ১৪ আগস্ট, কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরির তিনতলায় রায়া দেবনাথ সভাঘরে ভয়েস অফ হিন্দুস্থানের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এবং কাঞ্জিক, নিও ন্যাশনালিস্ট ও বৈভবী শাম্ভাবী ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত হলো ‘আগ্নেয় আগস্ট— বাঙ্গালি যা জানে; বাঙ্গালি যা জানে না’-শীর্ষক একটি আলোচনা সভা। এই সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দেবাশিস চৌধুরী, অনিমিত্র চক্রবর্তী ও সৌম্য বসু। সভাটি সঞ্চালনা করেন সোমেন সেনগুপ্ত। ক্লাউড নেটওয়ার্ক ইউটিউব চ্যানেলে সভাটি সম্প্রচারিত হয়। বক্তারা ‘অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস’-এর তাৎপর্য তুলে ধরার সঙ্গে ১৯৪৬-’৪৭ সাল জুড়ে তৎকালীন ভারতবর্ষ ও বঙ্গপ্রদেশের বুকে হয়ে যাওয়া অস্থির ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা, বঙ্গবিভাজন ও সমসাময়িক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। তাদের বক্তব্যে বিশদে উপস্থাপিত হয় ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট তারিখে কলকাতার বুকে মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন থেকে শুরু করে সেই বছরের ১০ অক্টোবর গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে ভয়াবহ হিন্দু গণহত্যার বিবরণ ও সমকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। বক্তাদের তরফে বহু অজানা তথ্য পরিবেশিত ও আলোচিত হওয়ায় সভায় উপস্থিত সকলেই সমৃদ্ধ হন।

মালদহ বাচামারী বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে রক্তদান শিবির

প্রতি বছরের মতো এবছরও গত ১১ আগস্ট মালদহ জেলার বামাচারী গভর্নমেন্ট কলোনি-স্থিত বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে ভারত জননীর বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭তম আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে একাদশতম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার। প্রধান আচার্য উপস্থিত সকলের সামনে এই দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ১১-১৮ আগস্ট পর্যন্ত সকলের পরিবারকে স্বদেশী সপ্তাহ পালনের বিষয়ে উৎসাহদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের আধিকারিক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধি দল, শিশুমন্দিরের সভাপতি, সম্পাদক, অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দ এবং প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা। শিশুমন্দিরের সভাপতি অম্লান গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে এবং সকলের পরিবারকে স্বদেশী সপ্তাহের অভিবাদন জানান। এরপর সকাল ৮.৩০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত চলে রক্তদান শিবির। এইদিন শিশুমন্দিরের সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ-সহ অভিভাবক-অভিভাবিকা, আচার্য-আচার্যা, প্রাক্তন বিদ্যার্থী-সহ মোট ৩২ জন রক্তদান রক্তদান করেন। শিশুমন্দিরের সভাপতি অম্লান গঙ্গোপাধ্যায় রক্তদানকারী সকলকে জনসেবা তথা লোককল্যাণকর কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গোপাল মুখোপাধ্যায় স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে! কলকাতা জুড়ে মুসলিম লিগের জেহাদি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। অসংখ্য হিন্দুর রক্তে ভেসে যেতে থাকে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত। বহু মহিলার সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটতে থাকে শহর জুড়ে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় চলতে থাকে ভয়াবহ 'ক্যালকাটা কিলিং'। সেই দিন হিন্দুদের রক্ষাকর্তা হয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নেওয়া মধ্য কলকাতার রাস্তায় আবির্ভাব ঘটে গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। অগ্নিযুগের বিপ্লবী সংগঠন আত্মোন্নতি সমিতি, যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতি, মুক্তিসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন বাঙ্গালি বীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আত্মোন্নতি সমিতির বিপ্লবী চিন্তানায়ক অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। জেহাদিদের ভয়াবহ আক্রমণের সামনে সেই ১৬ আগস্ট বীর-বিপ্লবী গোপাল মুখোপাধ্যায় গড়ে তোলেন আগ্নেয় প্রতিরোধ। তাঁর নেতৃত্বে পালটা প্রতিরোধ গড়ে ওঠার কারণে কলকাতা শহরে হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পায়। মধ্য কলকাতার বুকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন হলো— জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি। গত ১৬ আগস্ট আত্মোন্নতি-জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যৌথ উদ্যোগে মধ্য কলকাতায় মলঙ্গা লেনে ত্রিকোণ পার্কে বিকেল ৪টায় '১৬ আগস্ট ঐতিহাসিক প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় একটি সভা। এই সভায় প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত হয়েছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সুভাষ চক্রবর্তী, ডা: শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায়, রজত চক্রবর্তী, অনিমিত্র চক্রবর্তী, স্বর্ণাভ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক মলঙ্গা লেনে দাঁড়িয়ে বক্তারা তুলে ধরেন ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট বাঙ্গালি বিপ্লবীদের দ্বারা রডা কোম্পানির মাউজার পিস্তল-সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করার কাহিনি। প্রমথনাথ মিত্র, পুলিনবিহারী দাশ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দীদের বীরগাথা স্মরণের সঙ্গে তাঁদের সুযোগ্য উত্তরসূরি গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তরফে ডাইরেক্ট অ্যাকশন চলাকালীন বাঙ্গালির ত্রাণকর্তা হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন বক্তারা। আজ বাংলাদেশ জুড়ে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন চলাকালীন '১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট' স্মরণ করার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়েও বক্তারা আলোকপাত করেন। সভা শেষে উপস্থিত সকলে আগামী দিনে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে, সংকট মুক্তির লক্ষ্যে--- নরখাদকদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি হিন্দুর আগ্নেয় প্রতিরোধের প্রতীক বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হবেন বলে শপথগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা দিবসে আরোগ্য ভারতীর বনৌষধি প্রচার-প্রসার অনুষ্ঠান

গত ১৫ আগস্ট, সকাল কলকাতা শ্যামপুকুর অঞ্চলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নগরের লাহা কলোনি বসতিতে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করলো আরোগ্য ভারতী। এই অনুষ্ঠানে ভারতমাতার পূজা, জাতীয় পতাকা ও রাষ্ট্রীয় ধ্বজোত্তোলন এবং ওষধি গাছ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি জয়ন্ত সেন, প্রান্ত বনৌষধি প্রচার-প্রসার প্রমুখ অঙ্কিতা শূর, উত্তর কলকাতা জেলার সহ-সম্পাদক অমলা বসাক। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০ জন স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আরোগ্য ভারতীর তরফে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভিক্স তুলসী, রাম তুলসী, লেমনগ্রাস, থানকুনি, পুদিনা ইত্যাদি ভেষজ উদ্ভিদের ৫০টি চারাগাছ স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কারাগারে মুক্তিসূর্য

ভরা বর্ষা। দিনটা অসিতপক্ষের অষ্টমী। মাসটা শ্রাবণ আবার ভাদ্রও। এই বৈপরীত্য গণনারীতির পার্থক্যে। সেদিনের আকাশ রেঙে ওঠেনি গোধূলির লালিমায়। বরং মথুরার নীল অম্বর ছিল ঘনঘোর মেঘে ঢাকা। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার গাঢ় হচ্ছিল সেদিন মধ্যাহ্নবেলা থেকেই।

আকাশ-ভাঙা ধারাপাত সেওতো কোন অপরাহ্ন থেকেই। সে কী প্রবল বৃষ্টি! সঙ্গে মুহুর্মুহু অশনিসম্পাত। কালো গগনপটে রুপোলি বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা। ঘনঘন বজ্রনির্ঘোষে নিনাদিত যেন— 'কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট/রক্তজমাট শিকল-পূজার পাষাণবেদী'।

সেই রণনে কেঁপে কেঁপে ওঠে ঘরবন্দি মথুরাবাসী। সে কাঁপন আতঙ্কে। সে কাঁপন এক অজানিত পুলকে। ভয়, প্রকৃতির এই যে বি-রূপ, তা কি মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত! আজই কি শুরু শেষের সেদিন!

একই সঙ্গে আকাশের বিজলিচমকে বুঝি আগামীর মুক্তির আহ্লাদ মাতাল করে মথুরাবাসীকে। মনে হয়, এ নয় মহাপ্রলয়ের সংকেত, এ যেন মহামুক্তির মহা-আহ্বান। বিমোহিত মথুরাবাসী এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াতে প্রায় সাঁঝবেলা থেকেই শয্যাশ্রয়ী। পরম নিশ্চিন্তে ডুব দিয়েছে সকলে গভীর ঘুমের সাগরে।

নিত্য বৃন্দাবনে আজও সেই কৃষ্ণলীলা

মথুরায় সেদিন সকলের চোখেই আসন পেতে বসেছে ঘুমের মাসিপিসিরা। ঘুম নেই কেবল তিনজোড়া চোখে। মথুরায় রাজপ্রাসাদে বিনিদ্র মহারাজ কংস মহাশঙ্কায় অস্থির হয়ে করছেন পদচারণা। বারবারই মনে হয় তাঁর, আজই কি জন্ম নেবে তাঁর 'শিশুশমন' বোন দেবকীর অষ্টম গর্ভে! আজ থেকেই কি শুরু করতে হবে তাঁকে দশমীর দিন গোনা। ত্রস্ত মহারাজ কংস সেই নিদ্রাহীন চোখে কেবলই পায়চারি করেন। অপেক্ষা তাঁর কেবল একটি খবরের জন্য। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের কি হয়েছে জন্ম?

ঘুম নেই কংস কারাগারে শৃঙ্খলিত দেবকী-বসুদেবের চোখেও। মৌন প্রার্থনায় মুখর তাঁরা, এসো, এসো হে মধুসূদন, দুর্বৃত্ত সংহারে, পৃথিবীর পাপভার কমাতে অবতীর্ণ হও তুমি। স্থাপন করো আবার ধর্মরাজ্য। এসো— এসো হে ত্রিপুরারি!

কী এক অদৃশ্য মায়া! কারাগারের প্রহরী যারা সদাসতর্ক— তারাও অন্যান্য মথুরাবাসীর মতোই ঢলে পড়ে আছে কারাগারের বাইরে সীমাহীন নিদ্রার ভারে। পাশে রয়েছে তাদের অরক্ষিত অস্ত্র।

অবশেষে এল সেই পরমক্ষণ। কী এক আশ্চর্য বিভায় আলোকিত কারাগৃহ। পারিজাত সুবাসে আমোদিত অন্ধগৃহ। খুলে গেল মাতা দেবকী এবং পিতা বসুদেবের শৃঙ্খল। মুক্ত হন তাঁরা। ঠিক তখন মধ্যযাম। কারাগৃহে নবজাতকের ক্রন্দনধ্বনি। মা-বাবা দেবকী ও বসুদেব তখন এক আত্মহব্য আনন্দে আত্মহারা। নবজাতককে কোলে নিয়ে অনুভব করেন তাঁরা ভগবানের স্পর্শ পাওয়ার পুলক। তারপরই কিছুটা দিশাহারা। তারই মধ্যে আবার বজ্রপাত।

পথ পান বসুদেব। দেখেন খোলা কারাগারের দ্বার। যেন বোঝেন বিধাতার ইঙ্গিত। শিশু কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে পথ ধরেন তিনি গোকুলের।

গোকুল পথগামী

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে বসুদেব গোকুল-পথগামী। কৃষ্ণাষ্টমীর সেই মহারাত্রিতে মথুরার রাজপথ শুনশান। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছেন বসুদেব। বিরাম নেই ধারাপাতের। অকস্মাৎ উপলব্ধি বসুদেবের, কই গায়ে তো পড়ছে না একটি বিন্দুও। নবজাতকও অ-সিক্ত। সম্পূর্ণ শুষ্ক। এ অনন্তনাগ। সেই মহাদুর্যোগে এ কোন মায়া! বিস্মিত বসুদেব দেখেন সহস্র ফণা মেলে পেছনে অনন্তনাগ। সেই মহাদুর্যোগে এ এক আশ্চর্য আতপত্র— আশ্চর্য এক ছাতা। বসুদেব দেখেন তাঁর বক্ষলগ্ন নবজাতক তাকিয়ে আছেন তাঁরই দিকে। মুখে তার দিব্যহাসি। বসুদেব আঁকড়ে ধরেন শিশুকে আরও নিবিড়ভাবে নিজের উত্তরীয়ের মধ্যে। অনাবৃত থাকে শিশুর যুগল চরণ। বৃষ্টির কয়েকটি বিন্দু কেবল সে পা ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। কেন এমন হলো?

সাধকবাণী, পাপাচার পীড়িত ধরণী সেদিন আকুল হয়ে উঠেছিলেন পাপহারী ভগবানের একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য। বসুধার সেই বাসনা পূরণেই হয়তো ভগবান কৃষ্ণ তাঁর পা দু'টি রেখেছিলেন বসুদেবের চাদরের বাইরে। আর তাঁর চরণধোয়া জল মাটিতে পড়ে ওইভাবেই পূরণ করেন বসুমতীর বাসনা। বসুদেব চকিতে পুত্রকে আবার উত্তরীয়ে জড়ান। ঘন অন্ধকারে পান না পথের দিশা। আর তখনই দেখেন সামনে জ্বলছে শৃগালের দু'টি চোখ। সেই শৃগালই যেন ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে। সেই বসুদেবকে পথ দেখিয়ে সামনে সামনে চলে।

মথুরার সীমায় এসে আবার ব্যাকুল বসুদেব। কেমন করে পার হবেন তিনি এই উত্তাল যমুনা? তাঁর ওই ভাবনার মুহূর্তে সেই শৃগাল নামে জলে। পথ করে দেয় যমুনা নিজেকে যেন দ্বিধাবিভক্ত করে।

ঘন অন্ধকারে বর্ষণমুখরিত রাতে চলেছেন বসুদেব যমুনা-পথে আগুয়ান শৃগালকে অনুসরণ করে। মুহূর্ত আগে যে যমুনা ছিল উত্তাল, তা এখন স্থির-অচঞ্চল। বসুদেব তখন মধ্য যুমনায়। অকস্মাৎ যমুনা আবার তরঙ্গময়— সে তরঙ্গ ক্রমে ঊর্ধ্বগামী। ভীত বসুদেব আঁকড়ে ধরেন পুত্রকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে। প্রতিমুহূর্তে ভয়, এই বুঝি যমুনা ভাসিয়ে নেবে তাঁকে— সেইসঙ্গে তাঁর এই নবজাত পুত্রকে।

যেমন হঠাৎই উত্তাল যমুনা, তেমনই তার তরঙ্গরাজি বসুদেবের বুক পর্যন্ত উঠে শিশু কৃষ্ণের পা দু'টি ছুঁয়ে আবার ফিরে পেল আগের রূপে। বসুদেবও নিশ্চিন্তে যমুনা অতিক্রম করে পৌঁছে গেলেন গোকুলে। যমুনার এই হঠাৎ উত্তাল হয়ে ওঠা সেওতো ওই জগৎপতির চরণ ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই।

গোকুলে নন্দালয়ের পথে চলেছেন বসুদেব এবার কিছুটা শ্লথ চরণেই। এবার তাঁর বুকের ধন রেখে আসতে হবে সুহৃদ গোপরাজ নন্দের আশ্রয়ে। আসন্ন সেই বিচ্ছেদ বিরহে বসুদেব তাই মন্দগতি। সে রাতে গোকুলও নিস্তব্ধ, শুনশান। ঘরের বাইরে নেই কেউ। সকলেই নিদ্রামগ্ন। বসুদেবও তাই অপ্রতিহত। ধীর পায় বসুদেব প্রবেশ করেন নন্দের অন্তঃপুরে। যশোদা শুয়ে আছেন গভীর ঘুমসাগরে ডুবে। পাশে রয়েছে তাঁর সদ্যোজাত কন্যা। বসুদেব আস্তে আস্তে তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে যশোদার পাশে রেখে তুলে নেন তাঁর কন্যাকে। সতৃষ্ণ নয়নে তাকান পুত্রের মুখের দিকে। সে মুখে স্বর্গীয় হাসি। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই বসুদেব আবার মথুরামুখী। কারাগারে যে রয়েছে স্ত্রী দেবকী। তাই আর দেরি নয়। দ্রুত তাঁর গতি।

তোমারে বধিবে যে

কারাগারে প্রবেশ করেন বসুদেব। সব রয়েছে আগেরই মতো। দেবকী তখনও কেমন যেন আচ্ছন্ন। তাঁরই পাশে রাখেন তিনি যশোদার কন্যা— যোগমায়াকে। মুহূর্তে বদলে যায় সব। ছিন্নশৃঙ্খল অজগরের মতো জাপটে ধরে বসুদেবকে আগের মতোই। দেবকীর পাশে শায়িত কন্যা কেঁদে ওঠে তীব্র রবে। ঘুম ভাঙে প্রহরীদেরও। দ্রুত ছুটে যায় মহারাজ কংসকে দেবকীর সন্তান হওয়ার খবর দিতে।

অস্থির কংস বুঝি-বা স্থির। আগের আতঙ্ক সাপের ছেড়ে ফেলা খোলসের মতোই যেন খসে যায় আপনা থেকেই। ছোটেন তিনি দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান— তাঁর ভবিষ্যৎ ঘাতককে জন্মের মুহূর্তেই বিনাশ করার জন্য।

দেবকী আঁকড়ে ধরেন কন্যাকে। বলেন, এতো মেয়ে, এ কেমন করে হবে তোমার ঘাতক। একে ছেড়ে দাও দাদা। পায়ে ধরছি তোমার। বোনের সে আর্তিতে ক্ষণেকের জন্য বুঝি টলে কংসের মন। বুঝি-বা দ্রব হয় হৃদয় করুণায়। পর মুহূর্তে আবার কঠিন। হোক কন্যা— দেবকীরই গর্ভজাত তো— না, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই সবলে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে আছাড় মারতে যায় সামনের শিলাখণ্ডে।

অলৌকিকতার প্রকাশ তখনই। কংসের হাত পিছলে দিব্যপ্রভায় প্রকাশিত দেবী যোগমায়া হাসতে হাসতে উচ্চারণ করেন অমোঘ বাণী— তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

কংস তখন নৃশংস

সে দিব্যবাণী যেন বিদীর্ণ করে কংসের অন্তর। মহাধানুচীর কার্মুক থেকে ছুটে আসা সুতীক্ষ্ণ শায়কের মতোই দেবী যোগমায়ার ওই অমোঘ বাণীতে বিদ্ধ কংসের হৃদয় তখন রক্তাক্ত। মরণভয়ে ভীত কংস কী করবেন তা বুঝতে না পেরেই মহাভয়ংকর হন। না, ব্যর্থ করতে হবে ওই বাণী!

কিন্তু কেমন করে,— কেমন করে, কেমন করে! প্রভাতসূর্য ওঠার আগেই ডাকেন তিনি তাঁর মন্ত্রীদের। বলেন, কী করবেন এখন তিনি? মন্ত্রীরাও বিভ্রান্ত। তাই কোনো একটি সিদ্ধান্তের কথা জানাতে পারেন না তাঁরা। বরং জানান দেন নানা প্রস্তাব। তারই একটি গোকুলের নবজাতকদের হত্যা করা হোক। হত্যা করা হোক দু'তিন বছর বয়সের সকলকেই। এটিই পছন্দ হয় মহারাজ কংসের। তাই গোকুলের নবজাতকদের হত্যার জন্য পাঠান বিশ্বস্ত মহাবলী সব অসুরকে। আর তারাই হয়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার এক একটি তরঙ্গ।

গোকুলে নন্দোৎসব

মহারাজ কংস গোকুলের সব শিশুকে

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য। যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

হত্যার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত অসুরদের ছদ্মবেশে গোকুলে পাঠানো শুরু করেন। আর সেই সময় গোকুল মেতে উঠেছে গোপরাজ নন্দর পুত্র গোপালের জন্ম উপলক্ষ্যে উৎসবে আনন্দে। সে উৎসবের পরিচয়ে নন্দোৎসব হিসেবে। নাচ, গান, কাদা খেলা, দই-মাখনে মাখামাখি সে এক মনোৎসব। সে উৎসবে শামিল মহারাজ নন্দ থেকে গোকুলের সকলে। গোকুলের সেদিনের যে উৎসব আজ লোকোৎসবে পরিণত। সেই উৎসব স্মরণে লোকপ্রবাদ— 'তালের বড়া খাইয়া নন্দ নাচিতে লাগিল।' সে নাচের স্মৃতিতে আজও পালিত হয় উৎসব কেবল ব্রজভূমে নয়, সারা দেশে— সমান উৎসাহ-উদ্দীপনায়।

শুভ জন্মাষ্টমী

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যেই পালিত হয় জন্মাষ্টমী। তবে সর্বত্র যে একই নামে এটি পালিত হয় তা নয়। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতোই তাঁর জন্মতিথিরও নানা নাম। কোথাও এটি গোকুল অষ্টমী, কোথাও-বা যদুকুল অষ্টমী, আবার কোথাও কৃষ্ণাষ্টমী, অষ্টমী রোহিণী বা কৃষ্ণজয়ন্তী। নাম যাই হোক, উৎসবের কেন্দ্রে রয়েছেন সেই এক— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্বত্রই উৎসবটি পালিত হয় প্রায় একই ভাবে। আর সর্বভারতীয় এক অপরূপ রসে-রঙে-বৈচিত্র্যে এবং অবশ্যই হৃদয় বন্ধনে।

শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন মথুরায় দ্বাপর যুগে। হিন্দু জ্যোতিষিক গণনায় দিনটি ছিল সৌরভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে দিনটি পড়ে মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

অন্যদিক চান্দ্রমাসকে ভিত্তি করে জ্যোতিষিক গণনায় বলা হয়েছে ৩২২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১৮ অথবা ২১ জুলাই আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই গণনা মতে বাংলা মাস হয় শ্রাবণ। অথচ জন্মাষ্টমী পালন করা হয় ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে। এই পার্থক্যের কারণ, চান্দ্রমাস গণনার রয়েছে দু'টি রীতি। এক রীতিতে মাস শুরু হয় পূর্ণিমায় এবং শেষ হয় অমাবস্যায়। এই রীতিকে বলা হয় অমান্তক রীতি। অন্য এক মতে মাসের শুরু অমাবস্যায় এবং শেষ পূর্ণিমায়। এটিকে বলা হয় পূর্ণিমান্তক চান্দ্রমাস। এই গণনা পার্থক্যের জন্যই মাসের ওই পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাল

মর্ত্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের জীবনকাল মোট ১২৫ বছর আট মাস সাত দিন। তাঁর এই জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে মূলত— গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকাকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে জন্মের রাত থেকে প্রায় এগারো বছর তিনি কাটিয়েছেন গোকুল-বৃন্দাবনে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে মানুষের বাল্যকালকে ভাগ করা হয় তিনটি পর্বে। এই পর্ব তিনটি হলো— কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। প্রথমটির ব্যাপ্তি জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি দশ বছর পর্যন্ত এবং কৈশোরের সমাপ্তি পনেরো বছর বয়সে। তারপর থেকেই শুরু হচ্ছে যৌবনকাল।

এই হিসেব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের কৌমার ও পৌগণ্ডজীবন অতিবাহিত হয়েছে নন্দালয়ে। কৈশোর থেকেই শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রায় স্বাধীন।

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থেকেই ঠাঁই নাড়া। জগৎজুড়ে তাঁর অবস্থান। সেই কারণেই বোধহয় কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বদ্ধ নন তিনি। জন্মের পরই মথুরা থেকে তাঁর গোকুলে অবস্থান। স্থায়ী হলো না সে বাসও। গোকুলে থেকে গোপরাজ নন্দ তাঁকে নিয়ে নতুন বসতি গড়েন মথুরা থেকে দূরে বৃন্দাবনে। কংসের ভয়েই এই বাসান্তর। কিন্তু স্থায়ী হলো না সেই অবস্থানও। এবার এলেন তাঁরা নন্দগাঁওয়ে। এগারো বছর বয়সে সেখান থেকেই কৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় যান কংসের আহ্বানে— অক্রুরের সঙ্গে।

জন্ম-সংগ্রামী

বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ। অবতার, কিন্তু স্বয়ং ভগবান। তাঁর অবতারজীবনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি লীলা, প্রতিটি ক্রিয়াই মানুষের কাছে যেন বর্ণপরিচয়ের এক একটি পাতা। প্রতিটি পাতায় রয়েছে জীবনযাপনের নানা সঞ্জীবনী মন্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রামী। সে সংগ্রামের শুরু তাঁর জন্মমুহূর্ত থেকে। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চিত হলেন তিনি মাতৃবক্ষ থেকে। বিচ্ছিন্ন হলেন বাবা-মায়ের থেকে প্রায় জন্ম-মাত্র। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যহই শ্রীকৃষ্ণকে লড়াই করতে হয়েছে একের পর এক সংকটের সঙ্গে। যেভাবে মোকাবিলা করেছেন, তার মধ্যে অলৌকিকতার সন্ধান পান ভক্তজনেরা। তাঁর নিজের শিক্ষা, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। লড়তে হবে আন্তরিক ভাবে আত্মশক্তিতে নির্ভর করে। তাহলেই আসবে জয়। এগিয়ে আসবে সাহায্য সহযোগিতার হাতও।

জন্মের পরদিন গোকুলে নন্দালয়ে গোপ-গোপিনীরা যখন উৎসবে মেতেছেন, মৃত্যুভয়ে ভীত কংস ডেকে পাঠান ভীষণা রাক্ষসী পুতনাকে। নির্দেশ দেন মথুরা এবং আশপাশের সমস্ত অঞ্চলের শিশুদের হত্যা করার। নির্দেশ মতো রাক্ষসী পুতনা মেতে ওঠে শিশু হত্যায়। অবশেষে সে আসে গোকুলে।

এক সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে পুতনা প্রবেশ করে— মহারাজ নন্দের অন্দরমহলে। তার রূপ ও আচরণে মুগ্ধ সকলে। তাই পুতনা যখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নেয় তখনও বাধা দেয়নি কেউ। আদর করতে করতেই পুতনা তার বিষলিপ্ত স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে গুঁজে দেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্তন্যপানের অছিলায় তার প্রাণবায়ু শোষণ করেন। পুতনা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নেয় স্বরূপ। আছড়ে পড়ে সেখানেই প্রাণশূন্য হয়ে।

প্রাণ নিলেও কৃষ্ণ কিন্তু সম্মান দিলেন পুতনাকে মাতা হিসেবে তাঁকে স্তন্যপান করানোর জন্য। পুরাণ কাহিনি, বিগত জন্ম পুতনা ছিলেন দৈত্যরাজ বলির কন্যা। বামনকে দেখেই তাকে স্তন্যপান করানোর বাসনা হয়েছিল তার। কিন্তু বামনের ছলনায় পিতা বলিকে নিঃস্ব ও বিপর্যস্ত হতে দেখে তাকে হত্যার ইচ্ছা জাগে মনে। কৃষ্ণ অবতারে বলি-কন্যার দু'টি বাসনাই পূর্ণ করেন তিনি। ভক্তের কাছে তাই তো তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু।

শকটভঞ্জন

ব্যর্থ পুতনা। কংস আরও ভীত। এবার তিনি পাঠান শকটাসুরকে। অসুর নন্দালয়ে একটা শকট বা গোরুর গাড়ির রূপ নিয়ে পড়ে থাকে। মা যশোদা কিন্তু তা বুঝতে পারেন না। তাই ঘুমন্ত কৃষ্ণকে সেই গাড়ির নীচে শুইয়ে ব্যস্ত হলেন ঘরের কাজে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়িরূপী অসুর পিষে মারার কথা ভাবে। তার ভাবনা অজানা থাকে না কৃষ্ণের। তিনি তাঁর ফুলের মতো পা-দিয়ে ওই শকটে বেশ জোরে একটি লাথি মারেন। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ে শকট। মারা যায় অসুর। গাড়ি ভাঙার শব্দে ছুটে আসেন মা যশোদা। শিশু কৃষ্ণকে কোলে তুলে রক্ষামন্ত্র জপ করতে থাকেন।

যমলার্জুন ভঙ্গ

কাটে দিন। হামাগুড়ি ছেড়ে টলমলে পায় কৃষ্ণ ঘুরে বেড়ান এ-ঘর সেঘর। দুধ-দই-মাখনের পাত্র ভেঙে, সে সব সকলকে বিলিয়ে এবং কিছুটা খেয়ে, গায়ে মেখে

ব্যতিব্যস্ত করে মাকে। মা রাগেন আবার ভালোও বাসেন বালক কৃষ্ণের এসব কাজ। সেদিন কিন্তু রেগে গেলেন মা। শিশুকে কোমরে দড়ি বেঁধে সেটা আবার বাঁধেন এক উদুখলে। বলেন, দেখি এবার কী করো তুমি?

কৃষ্ণ প্রথমে একটু কান্নাকাটি করেন। সেটা করতে হয় বলে। কান্নায় কাজ না-হওয়ায় ওই দড়িবাঁধা অবস্থাতেই উদুখলটা টানতে টানতে চলে আসেন বাইরে। অদূরে ছিল জোড়া অর্জুন গাছ। এগিয়ে চলেন দুই গাছের ফাঁক দিয়ে। উদুখল আটকে যায় দুই গাছে। চলে টানাটানি। এক সময় উপড়ে পড়ে গাছ দু'টি। দুই গাছের মাঝে অক্ষত কৃষ্ণ। গাছ পড়ার আওয়াজে ছুটে আসেন গোপরাজ নন্দ। কোলে তুলে নেন অক্ষত কৃষ্ণকে। আর প্রণাম জানান ঈশ্বরকে পুত্রকে রক্ষা করার জন্য।

তৃণাবর্ত বধ

কৃষ্ণের বয়স তখনও তিন পার হয়নি। তখনও চলছে তাঁর কৌমার কাল। তেমনি একদিনে তাঁকে কোলে নিয়ে বসে আছেন মা যশোদা। বসেন এসব প্রায়ই রোজই। কিন্তু সেদিন যেন বেশ ভারী মনে হয় ছেলেকে। ভার যেন ক্রমেই বাড়তে থাকে। কোলে রাখতে কষ্ট হয় মায়ের। এক সময় সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে দেন। আর তখনই শুরু হয় প্রবল ধূলিঝড়।

ধুলোবালিতে ঢেকে যায় চারিদিক। দেখা যায় না পাশের জনকেও। এমন হঠাৎ ঝড়ে আতঙ্কিত সবাই। আসলে ওটা প্রাকৃতিক কোনো ঝড় নয়। এতক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করছিল কংসের অনুচর অসুর তৃণাবর্ত। সুযোগ বুঝে তৃণাবর্তই তৈরি করে ওই ঝড়। তারই মধ্যে কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে উড়ে চলে আকাশপথে।

কৃষ্ণও যেন ভীত। তাই আঁকড়ে ধরেন তৃণাবর্তকে। তারপর বাড়তে থাকে ভার। কৃষ্ণর দু'বাহুর চাপ আর ভারে হাঁসফাঁস করতে করতে একসময় আছড়ে পড়ে মাটিতে। বিগতপ্রাণ অসুরের বুকে বসে হাসছেন তখন কৃষ্ণ। ধুলোঝড়ও অপসৃত।

কৃষ্ণের কোনো ক্ষতি হয়নি দেখে আহ্লাদিত সকলে। কিন্তু এই যে বারবার ঘটছে নানা উৎপাত— বিভিন্ন উপদ্রব, তাতে গোকুলকে আর নিরাপদ মনে হয় না সকলের। তাই গোকুল ছেড়ে তাঁরা বৃন্দাবনে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। বৃন্দাবনে যখন বসতি গড়েন তাঁরা, সেসময় কৃষ্ণের বয়স তিন পার হয়েছে সবে। অর্থাৎ গোকুল কৃষ্ণলীলার কেন্দ্র ছিল মোট সাড়ে তিন বছরের মতো।

এবার বৃন্দাবনে

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের মতো। মোটামুটি ছ'বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন বৃন্দাবনে। ছ' বছর বয়সে তিনি চলে যান বৃন্দাবনের অদূরে গোপরাজ নন্দের পৈতৃক আবাস নন্দগাঁওয়ে। সেখানে ছিলেন দশ থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত। তারপরই তাঁর মথুরা যাত্রা। বলা যায় তারই সঙ্গে শেষ তাঁর বৃন্দাবন তথা বাল্যলীলার প্রায় সবটাই।

হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী পনেরো বছর পর্যন্ত সময়টা বাল্যকাল হিসেবেই বিবেচিত হয়। যদিও এগারো থেকে পনেরো বছর সময়টার নাম কৈশোর। সে অর্থে শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলার শুরু তাঁর কৈশোরকালে।

উৎপাত উপদ্রবের ভয়ে গোপরাজ নন্দ বৃন্দাবনে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে বালক কৃষ্ণ নানা লীলারঙ্গে মাতলেও সেই উৎপাত উপদ্রব কিন্তু লেগেই থাকে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, গোপবালকরা পাঁচ বছর বয়স থেকে গোষ্ঠে যায়। অর্থাৎ শুরু হয় তাদের রাখালিয়া জীবন। সেই ধারাতেই কৃষ্ণ-বলরামেরও গো-চারণে যাওয়া শুরু পাঁচ বছর হতেই। গোচারণের সময় কৃষ্ণ যেসব লীলা করেন সাধারণভাবে তা পরিচিত গোষ্ঠলীলা হিসেবে। এই জীবনকাল একইসঙ্গে বাৎসল্য, সখ্য, শান্ত, দাস্য ও মধুর রসের ধারায় সিক্ত।

বসতি বদল করলেও কংসের কোপ থেকে রক্ষা পান না গোপেরা। একের পর এক অসুরকে পাঠায় কংস কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। আর গোকুলের মতোই এরা সকলেই কৃষ্ণকে মারতে এসে তাঁরই হাতে মারা যায়। এই পর্বে কৃষ্ণের হাতে নিহত অসুরদের মধ্যে আছে অঘাসুর, বকাসুর, ধেনুকাসুর ইত্যাদি।

এই পর্বে কৃষ্ণের অন্যান্য লীলার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কালীয়নাগকে দমন করে তাকে তার পূর্ব বাসস্থান রামানক দ্বীপে পুনর্বাসিত করা। মহাশক্তিধর গরুড়ের ভয়ে রামানকদ্বীপ ছেড়ে বৃন্দাবনে যমুনায় বাস করতে থাকে। তার বিষে ওই অঞ্চল হয়ে ওঠে জনশূন্য। শেষে বালক কৃষ্ণই ওই ভয়ংকর কালীয়কে দমন করেন। রামানকদ্বীপে গরুড় আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর বরাভয়ই কালীয় যমুনা থেকে চলে যায়। সেই সঙ্গে ওই অঞ্চল আবার ফিরে পায় তার পূর্ব পরিবেশ।

কালীয়দমনের মতোই বালক কৃষ্ণ গোবর্ধনগিরি ধারণ করে তাঁর ঐশ্বর্য বা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটান এই বৃন্দাবনেই।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আরেক বিশেষ অধ্যায় হলো গোপিনীদের সঙ্গে রঙ্গবিলাস। এর মধ্যে রয়েছে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা। রাস কৃষ্ণজীবনের এক বৈশিষ্টপূর্ণ লীলা। এই রাসলীলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে বৈষ্ণবীয় ধর্মসাধনার একটি ধারা। একইসঙ্গে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় দর্শন। সে দর্শন এক মহাসাগর। এক কথায় সে দর্শনের স্বরূপ প্রকাশ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে কেবল একটি কথাই বলতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যে যাঁরা আদিরসের সন্ধান পান তাঁরা ভুলে যান, ওই লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল এগারো বছরেরও কম। মূলত পাশ্চাত্য ধারায় বিশ্লেষণ করতে গিয়েই রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করে তার মধ্যে আদিরসের সন্ধান করাটা ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দু ধর্মসাধনাকে কলুষিত করারই এক অপচেষ্টা।

সেই শোনে যার শ্রবণ আছে

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ভারতীয় জীবনদর্শন ও ধর্মচর্চার এক বর্ণালী প্রকাশ। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ও জীবনের একটি অপরূপ উদ্ভাস দেখা যায়। একইসঙ্গে এই লীলার মধ্য দিয়েই দেখা গেছে পঞ্চরসের উৎসার। আর সেই সব রসের ধারাই প্রবাহিত হয়েছে মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা, নিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণের এক পরম আকুতিকে আশ্রয় করে। ভক্তি ও সেবার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এই লীলাপর্বে। ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ধর্মপ্রাণ ভারতীয় এখনও সাধনার মধ্য দিয়ে মন-নিত্যবৃন্দাবনে কৃষ্ণের সেই লীলা দর্শন করেন।

সেই দর্শন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়েই তাই উচ্চারিত হয় পরম আশ্বাস, এক আন্তরিক অমোঘ বাণী— 'এখনও তেমনি ব্রজের মাঝে, /শ্যামরায়ের বাঁশরী বাজে,/এখনও তেমনি বহে যমুনা কুলুকুলু নাদে।' —কে বলে নাই শ্যাম বৃন্দাবনে/কে বলে বাজে না বাঁশি সে কাননে/এখনও বাজে, এখনও বাজে/সেই শোনে যার শ্রবণ আছে।' ◻

সম্ভবামি যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

গোপাল চক্রবর্তী

পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উত্থান ঘটেছে তখন ভগবান সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতীদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বাপরযুগে নৃপতিরূপী দানবদের দ্বারা পৃথিবী নিগৃহীতা, তাদের দুরাচারী সৈন্যদের পদভারে ধরণী কম্পমান। তখন আক্রান্তা ধরণী পরিত্রাণের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

''ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ।।''
(শ্রীমদ্‌ভাগবতম্–১৭.১.১০)

গাভীরূপ ধারণ করে পৃথিবী ব্রহ্মার সকাশে তাঁর নিগ্রহের কাহিনি বর্ণনা করলেন। ধরণীর রোদনে ব্যথিত ব্রহ্মা প্রতিবিধানের জন্য ইন্দ্রাদিদেবগণ-সহ ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর সমীপে সমবেত দেবতারা বেদমন্ত্রদ্বারা ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা আকাশবাণীর মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ শ্রবণ করলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে জানালেন যে গোলকপতি বিষ্ণু পূর্বেই পৃথিবীর বৃত্তান্ত অবগত আছেন। তিনি স্বয়ং মর্ত্যলোকে প্রকট হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করবেন। দেবতাগণের কাছে ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ যতদিন তিনি নরলীলা প্রকটিত করবেন ততদিন দেবতারাও যদু,পাণ্ডব প্রভৃতি বংশে জন্মগ্রহণ করে পার্ষদরূপে তাঁর সান্নিধ্যে থাকবেন। পুরুষোত্তম ভগবান বিষ্ণুও স্বয়ং যদুবংশীয় বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। দেবাঙ্গনাদের প্রতিও নির্দেশ, তাঁরাও ভগবানের সেবা এবং প্রীতি উৎপাদনের জন্য ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করবেন। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ও প্রিয়কার্যের নিমিত্ত সহস্রমস্তক শেষনাগও ভগবানের আগেই আবির্ভূত হবেন। গোলকেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীও ব্রজভূমে বৃষভানুর কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়ে শ্রীরাধা নাম পরিগ্রহ করবেন।

আর এক লীলা। শূরসেন শূরনন্দন বসুদেব দেবককন্যা দেবকীকে বিবাহ করে আপন গৃহে ফিরছেন। ভগ্নীস্নেহ পরবশ উগ্রসেন তনয় কংস আপন হস্তে অশ্বের রাশ ধারণ করে সারথি রূপে রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দৈববাণী —''রে মূর্খ! যাকে তুমি পতিগৃহে নিয়ে যাচ্ছ তার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বধ করবে।''

কংস এই আকাশবাণী শ্রবণমাত্র প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে কেশাকর্ষণ পূর্বক দেবকীকে রথ থেকে নামিয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। বসুদেব বিনীতভাবে নানা নীতিকথা বলে কংসকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অঙ্গীকার করলেন দেবকীর সব সন্তানকে জন্মমাত্র কংসের হাতে তুলে দেবেন। ক্রূর, খল,

ফঃ ৫

পাপাত্মা কংস এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দেবকীকে রেহাই দিলেন। এরপর দেবকীর গর্ভজাত ছ'টি সন্তানকে নিরুপায় বাসুদেব নির্মম নির্দয় কংসের হাতে তুলে দিলেন হত্যা করার জন্য।

শ্রীহরির আদেশে যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে বাসুদেবের অন্য স্ত্রী নন্দ-যশোদার আশ্রয়ে অবস্থানরতা রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন। আবার নন্দপত্নী যশোদার গর্ভজাত কন্যারূপে আবির্ভূতা হওয়ার জন্য ভগবান যোগমায়াকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।

এদিকে কংসসকাশে এলেন দেবর্ষি নারদ। তিনি কংসকে জানালেন যে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং কংসকে বধ করার জন্য ধারাধামে অবতীর্ণ হবেন। পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যগণের বিনাশের জন্য দেবতারা নানা রূপে ধরাধামে জন্ম নিয়েছেন। দেবর্ষি নারদ এই বলে প্রস্থান করলে কংস যদুবংশীয়দের দেবতা এবং স্বয়ং বিষ্ণুই তার বধের উদ্দেশ্যে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হবেন বলে মনে মনে ভাবতে লাগল। এইরূপ নিশ্চয় করে কংস বসুদেব-দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং তাদের পুত্র জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর আশঙ্কায় তাদের বধ করতে লাগল। পূর্বে বিষ্ণু কালনেমি নামক মহাসুরকে নিধন করেছেন। এই জন্মেও বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হওয়ার আশঙ্কায় কংস সর্বদা সন্ত্রস্ত। এই কারণে বসুদেব-দেবকীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিয়োজিত করল। কংস পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করে যদুগণের সঙ্গে বিরোধ শুরু করল। তার পিতা উগ্রসেন যদু, ভোজ ও অন্ধকদের অধিপতি ছিলেন, কংস তাঁকে কারারুদ্ধ করে শূরসেন প্রভৃতি প্রদেশগুলি নিজের করায়ত্ত করল।

শ্রীভগবান কুক্ষিমধ্যে অবস্থান করায় দেবকী আপন প্রভায় অন্ধকার কারাগৃহ আলোকিত করছেন। এই দুর্বিসহ বন্দি দশাতেও তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে ও হাস্যে সমুজ্জ্বল। কংস একদিন এই অবস্থায় দেবকীকে দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হলো। কংস ভাবল তার প্রাণহন্তা হরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছে। নচেৎ এত প্রভাময়ী দেবকী কোনোদিনও ছিল না। ভীত কংস এই মুহূর্তে তার করণীয় কী তা স্থির করতে পারল না।

বৈরানুবন্ধ-জনিত ভয়ে সেই সময় কংস উপবেশন, শয়ন, অবস্থা, ভোজন, ভ্রমণ ও পানাদি সর্ববস্থাতে সর্বইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করতে করতে সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় দেখতে লাগল।

''আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন মহীম্।

চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ংজগৎ।।''

অনন্তর সেই সর্বগুণসম্পন্ন পরম রমণীয় সময় উপস্থিত হলো, প্রাকৃতজন্মরহিত শ্রীভগবানের জন্মনক্ষত্র (রোহিণী) উদিত হওয়ায় অপর নক্ষত্র গ্রহ ও তারাগুলি প্রশান্তভাব ধারণ করল। নগর গ্রাম ব্রজ ও আকর সমূহের বিবিধ মঙ্গলে ধরিত্রী মঙ্গলময়ী হলেন। নদীসমূহ স্বচ্ছসলিলা হলো, হ্রদসমূহ পদ্মের শোভায় শোভিত হলো। ভ্রমর গুঞ্জন ও পাখির কলকাকলিতে মুখরিত পুষ্পগুচ্ছদ্বারা সুশোভিত বনভূমি মোহনীয় হয়ে উঠল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের নির্বাপিতপ্রায় হোমাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। দেবগণ ও সাধুগণের মন প্রফুল্ল হতে লাগল। সর্বগুণ সুলক্ষণ বিশিষ্ট সেই রমণীয় সময়ে জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপক্রম হলে দেব দুন্দুভি বেজে উঠল। কিন্নর ও গন্ধর্বগণ ভগবানের গুণগান করতে লাগলেন। বিদ্যাধর ও অপ্সরারা আনন্দে নৃত্য লহরী তুললেন। দেবতা ও মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে কুসুম বর্ষণ করতে লাগলেন।

শ্রাবণের ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্ধরাত্রি ভক্ত, মুনি ও দেবগণের সমবেত প্রার্থনা সমুদ্র ও জলধরের গর্জনের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব ঐক্যতান সৃষ্টি করল। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ সর্বাংশে পরিপূর্ণ হয়ে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের ন্যায় দেবরূপিনী দেবকীতে আবির্ভূত হলেন। তখন বসুদেব অপূর্বমূর্তিধারী বালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করলেন। তাঁর নেত্রযুগল নীল কমল সদৃশ, তিনি চতুর্ভুজ এবং ওই ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিদ্যমান। তখন পরম ভাগ্যবান বসুদেব দুষ্ট অসুর সংহারক শ্রীহরিকে পুত্ররূপে আবির্ভূত দেখে বিস্ময়ে তাঁর নয়নযুগল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে স্বীয় প্রভাদ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী ওই বালককে পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ পরমপুরুষ ভগবান মনে করে নির্ভয় চিত্তে স্তব করতে লাগলেন।

''স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।

তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রাবিষ্ট ইব ভাব্যসে।।

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্—১৪.৩.১০

বসুদেব বললেন হে ভগবন, আমি আপনাকে জানতে পারলাম, আপনি প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা বা গুণাতীত পরমপুরুষ, কেবল অনুভব ও আনন্দই আপনার স্বরূপ কিংবা আপনি কারও গোচরীভূত না হলেও আপনার অনুভবেই আনন্দ হয়, আপনি অন্তর্যামী পরমাত্মা হয়েও আমার নয়নগোচর হলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

এই প্রকারে বসুদেবের স্তব শেষ হলে কংসভয়ে ভীতা মাতা দেবকী আপনপুত্র মহাপুরুষের লক্ষণ দর্শনপূর্বক অতি বিস্মিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

''রূপং যত্তং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং

ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকায়ম্।

সত্তামাত্রাং নির্বিশেষংনিরীহৎ

স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ।।''

মাতা দেবকী বললেন—হে প্রভো, বেদসকল যাকে অব্যক্ত,

সর্বকারণ, বৃহৎ, চেতন, নির্গুণ, নির্বিকার সত্তামাত্র নির্বিশেষ ও নিশ্চেষ্ট বলে থাকেন, আপনি সেই বুদ্ধ্যাদিকরণসমূহের প্রকাশক, সাক্ষাৎ বিষ্ণু।

এইরূপে শ্রীভগবান বসুদেব ও দেবকীর স্তুতিবাক্যে পরমানন্দিত হয়ে আপন আবির্ভাব ও পূর্বদেহের বিবরণ ব্যক্ত করলেন। যুগে যুগে বসুদেব ও দেবকীর পুত্র রূপে ভগবান প্রকটিত হয়েছেন। শ্রীহরির পূর্বতন জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য পিতা-মাতাকে এই চতুর্ভুজ বিশিষ্ট অলৌকিক রূপ দর্শন করালেন। অন্যথায় মনুষ্য চিহ্নদ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ভগবান পিতা-মাতাকে আশ্বাস দিলেন তাঁরা যদি একবার তাঁকে ব্রহ্মভাবে চিন্তা করেন বা পুত্রভাবে স্নেহ করেন তাহলে সংসার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা বৈকুণ্ঠে আরোহণ করবেন। এইবার ভগবান পিতার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘‘এখন আমি এই রূপ সংবরণ করে প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করবো। যদি কংসের ভয় করে তবে আমাকে গোকুলে নন্দগৃহে রেখে আমার মায়া সেখানে যশোদা-কন্যারূপে জন্ম নিয়েছে, তাকে নিয়ে এসো।”

দেবকী ও বসুদেব প্রত্যক্ষ করলেন সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি অন্তর্হিত, দেবকীর পাশে রয়েছে নবজাতক।

বসুদেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন তাঁর পায়ের শৃঙ্খল আপনাআপনি খুলে গেছে। তিনি তখন সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে সযত্নে একটি পেটিকায় স্থাপন করে মাথায় নিয়ে কারাগৃহ থেকে বাইরে যেতে ইচ্ছা করলেন, তখনই অজা নামে প্রসিদ্ধা যোগমায়া নন্দপত্নী যশোদা হইতে আবির্ভূতা হলেন। অতঃপর মায়া কর্তৃক দ্বারপাল সকলের জ্ঞান-কারণ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ অপহৃত হলে তারা জ্ঞান হারালে বৃহৎ কপাট সমূহ উন্মুক্ত হয়। লৌহশৃঙ্খল আপনি খসে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে এলেন বসুদেব। সঙ্গে শিশুপুত্র, অবিরাম শ্রাবণের ধারা। বিচলিত হলেন তিনি, নব জাতকের অঙ্গে জল লাগবে, শেষনাগের মাথার উপর ফণাবিস্তার দেখে নিশ্চিন্ত হলেন বসুদেব। দ্রুত পদে দাঁড়ালেন যমুনার তীরে। ওপারে গোকুলে যেতে হবে, কিন্তু উত্তাল যমুনা পার হবেন কী করে? মায়া তখন এক শৃগালের রূপ ধরে হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। শৃগালের পশ্চাৎ বসুদেব যমুনা পার হলেন। মায়ার প্রভাবে সুপ্তিমগ্ন গোকুল। বসুদেব পৌঁছালেন নন্দালয়ে। নিদ্রাবিভূত যশোদার পাশে আপন সন্তানরূপী নারায়ণকে রেখে তুলে নিলেন যশোদার কন্যারূপী স্বয়ং মহামায়াকে। বসুদেব আবার ফিরে এলেন কারাগারে কন্যাকে নিয়ে। দেবকীর পাশে কন্যাকে রেখে বন্ধ করলেন উন্মুক্ত লৌহকপাট। পূর্ববৎ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলেন নিজেকে।

এতক্ষণ এই কন্যা রোদন করেনি, এখন কার্যশেষ বুঝে সদ্যোজাতের স্বভাবসিদ্ধ রোদন শুরু করল। এই রোদনধ্বনি শ্রবণে প্রহরীদের তন্দ্রা টুটে গেল। তারা কংসের কাছে দেবকীর অষ্টম সন্তানের আগমনবার্তা দিতে ছুটে গেল। কংস এতক্ষণ এই সংবাদের প্রতীক্ষায় ছিল। সে ছুটে এল কারা কক্ষে, কিন্তু একি এযে কন্যাসন্তান! এই কন্যা মহাবলী কংসকে হত্যা করবে? চিন্তিত কংস। কংসকে দেখে দেবকী আপন সন্তানের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত থেকেও প্রিয়সখী যশোদার কন্যাবধের আশঙ্কা করে দুঃখিত মনে কংসকে বলতে লাগলেন—

—হে ভ্রাতঃ! আমি আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নী। সন্তানগুলি নিহত হওয়ায় আমি নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েছি। আপনি কৃপাপরবশ হয়ে পুত্রভাগ্যহীনা আমার সদ্যোজাত কন্যাটিকে হত্যা করবেন না। এই কন্যাটি আমাকে দান করুন।

দুরাত্মা কংস ভগ্নীর এই করুণ আর্তিকে তিরস্কার করে তাঁর কোল থেকে কন্যাটিকে কেড়ে নিল। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বজনস্নেহ বিনাশকারী কংস সেই সদ্যোজাত কন্যাটির পদদ্বয় ধারণ করে শিলার উপরে সজোরে নিক্ষেপ করল। কিন্তু সেই কন্যা শিলাখণ্ডে পতিত না হয়ে উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে অষ্টভুজা দেবীমূর্তিতে উদ্ভাসিত হলেন। সেই অষ্টভুজে ধনুঃ, শূল, বাণ, চর্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা— এই আটটি আয়ুধ ধারণপূর্বক স্বর্গীয় অপূর্বমাল্য, বস্ত্র, চন্দন ও বিবিধ রত্নাভরণে বিভূষিতা হয়ে কংসাদি সকলকে দর্শন দিলেন। সিদ্ধচারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নরগণ সেই দেবীকে স্তবগান এবং উপহার সামগ্রীতে পরিতুষ্ট করলেন। সেই দেবী তখন কংসকে লক্ষ্য করে বললেন—‘‘রে মন্দমতি দুরাচারী! যিনি তোকে পূর্বজন্মে বধ করেছিলেন তিনি এই জন্মেও তোকে বধ করবেন বলে নির্দিষ্ট স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন।

সেই জন্য অদ্য তোকে বিনাশ করলাম না। তোর ধ্বংস অনিবার্য। মাতা দেবকীকে তুই আর বন্ধনাদির দ্বারা বৃথা কষ্ট দিবি না, স্বামীসহ তাঁর বন্ধনমুক্ত কর।”

এই কথা বলে দেবী মহামায়া অন্তর্হিতা হলেন। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিই জন্মাষ্টমী

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারত আত্মার এক জ্যোতির্ময় প্রতীক, এক মূর্ত বিগ্রহ। পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ যেমন সমস্যা জর্জরিত মানুষের সমস্যা মোচন করে নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারে তেমনই আশাহত মানুষের জীবনে সঞ্চার করতে পারে বাঁচার নতুন পথ।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ তথা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর আগমন ঘটেছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে জগতে অধিষ্ঠিত ছিল দ্বাপর যুগ। সে সময় অসুর রাজারা ছিল খুবই অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। তাদের অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে দেব-দেবীরা এই নিষ্ঠুর অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষীর সমুদ্রে শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু তাঁদের সম্মিলিত প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি যদু বংশীয় রাজাদের রাজধানী মথুরায় রাজা সুরসেনের পুত্র বসুদেবের সন্তান রূপে দেবকীর অষ্টম গর্ভে অবতীর্ণ হবো। দেব-দেবীরা আমার নির্দেশ অনুসারে মথুরা এবং ব্রজের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবে।'

তখন মথুরায় রাজত্ব করছিলেন রাজা উগ্রসেন। তিনি ছিলেন যেমন ধার্মিক, তেমনই প্রজাবৎসল। কিন্তু এহেন ধর্মপ্রাণ রাজার পুত্র কংস ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনই অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সিংহাসন লাভের জন্য তিনি তার ধার্মিক পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে কারাগারে বন্দি করেন। কংস আবার দেব আরাধনায় বরলাভ করেছিলেন যে, এই জগৎসংসারে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ব্যতিরেকে কেউই তাকে হত্যা করতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই দেব বরে বলীয়ান কংস এক দুর্জয় শক্তির, উন্মত্ত দম্ভের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। এরপর সময় মতো ভগিনীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং নিজে সারথি হয়ে রথে চাপিয়ে যখন চলছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সেই দৈববাণী হয়, 'ওরে নির্বোধ, যাঁকে তুই রথে করে নিয়ে যাচ্ছিস, তাঁরই গর্ভের অষ্টম সন্তান তোর মৃত্যুর কারণ হবে'। দৈববাণী শোনা মাত্রই কংস খড়্গ হাতে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন, তখন বসুদেব অনেক অনুনয় বিনয় করে কংসের কাছে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন যে, যতবারই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সেই সন্তানকে ততবারই কংসের হাতে সমর্পণ করে দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি শুনে কংস শান্ত হলো বটে কিন্তু দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এদিকে কারাগারে থাকাকালীন এক এক করে যত সন্তান জন্ম নেয় কংস তাদের সকলকে দেওয়ালে আছাড় মেরে হত্যা করে ভয়মুক্ত হয়। এইভাবে সপ্তম গর্ভের সন্তান বলদেব যখন দেবকীর গর্ভে আসে তখন ভগবানের নির্দেশে যোগমায়া দেবকীর গর্ভের সন্তানকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেন এবং প্রচার করা হয় যে, দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। এর পরেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, দেবকীর গর্ভে আসছে অষ্টম গর্ভের সেই দৈব সন্তান ভগবান বিষ্ণু। কংস আগেভাগেই এই সুযোগকে একেবারেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তাই আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি সুরক্ষা বাড়িয়ে দেয়।

সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথি, গোটা প্রকৃতি ছিল ভয়াল রুদ্ররূপে পরিপূর্ণ। আকাশ, বাতাসে যেন বিদ্যুতের ঝলকানির তাণ্ডবলীলা চলছিল, ঠিক এমন সময় ঝিল্লির মঞ্জরী, বজ্র মাণিক দিয়ে শোভিত বরণমাল্য, নয়নাভিরাম শ্যামল শোভার অপরূপ সৌন্দর্যের অমরাবতীতে সুরলোকের শঙ্খ নিনাদে, নরলোকের ডঙ্কায় আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

প্রতি বছর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের প্রকটকালে সারা ভারতে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। জন্মাষ্টমীর সমগ্র অনুষ্ঠানকে দুই ভাবে পালন করা হয়, একটি হলো— গীত বাদ্য-সহ এক নাটকীয় উপস্থাপনায় দেখানো হয় শিশু কৃষ্ণের ছোটোবেলার কর্মকাণ্ড। এই উৎসব মূলত ভারতের মথুরা, বৃন্দাবন, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মহাসমারোহে পালিত হয়। অপরটি হলো দহি-হাণ্ডি প্রথা, যেখানে কৃষ্ণের দুষ্টুমি বিশেষ করে মাখন চুরির ঘটনা, যেখানে উচ্চস্থানে বেঁধে রাখা মাখনের হাঁড়ি শিশুরা একে অপরের ঘাড়ে উঠে সেই হাঁড়ি ভাঙার চেষ্টা করে। বহু জায়গায় জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানকে নন্দোৎসব হিসেবেও পালন করা হয়। যেখানে কৃষ্ণের জন্ম হওয়ায় নন্দরাজা সকলকে উপহার বিতরণের কাহিনি উপস্থাপনা করা হয়। জন্মাষ্টমীর দিন বঙ্গপ্রদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসা ব্যক্ত করার জন্য সারাদিন উপবাস করেন, ধর্ম, গীতিচর্চা করেন। মধ্যরাতে শ্রীকৃষ্ণের ছোটো মূর্তিকে স্নান করিয়ে দোলনায় সাজিয়ে রাখা হয়। এরপর উপবাসকারী প্রসাদ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন। যুগ যুগ ধরে জন্মাষ্টমী উৎসব এই ভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ সাড়ম্বরে পালন করে আসছেন কৃষ্ণভক্তরা। ▯

ব্যবহৃত ব্যাটারি থেকে লিথিয়াম নিষ্কাশনের নতুন উপায় সোহিনীর গবেষণায়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দূষণ রুখতে পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে ক্রমশ ইলেকট্রিক জানবাহনের দিকে ঝুঁকছে গোটা বিশ্ব। এর পাশাপাশি ধীরে ধীরে পরিবেশবান্ধব শক্তির অন্যতম উৎস হয়ে উঠছে ইলেকট্রিক ব্যাটারি। এই ব্যাটারির অন্যতম উপাদান হলো লিথিয়াম। গাড়ি, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা গ্রিড-স্কেল এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম— সব কিছুতেই চাহিদা বাড়ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির। পরিসংখ্যানধর্মী একটি তথ্যে প্রকাশ যে আগামী আট বছরে বিশ্বে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির বাজার বৃদ্ধি পাবে প্রায় ২৩ শতাংশ। এই রাসায়নিক মৌল পদার্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ যা খনি থেকে উত্তোলিত হয়ে থাকে।

সেই লক্ষ্যে একটি বৈজ্ঞানিক উপায় বের করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টারত রয়েছেন আমেরিকার হিউস্টনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক। বিজ্ঞানী পুলিকেল অজয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন বঙ্গতনয়া সোহিনী ভট্টাচার্য। এই গবেষক দলের তরফে 'অ্যাডভান্সড্ ফাংশনাল মেটিরিয়ালস্'- নামক একটি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এই সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র। ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির ক্যাথোড থেকে মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে কীভাবে প্রায় ৫০ শতাংশ লিথিয়াম নিষ্কাশন সম্ভব— সোহিনী-সহ অন্য গবেষকরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে সেই পথই দেখিয়েছেন। সোহিনীদের অনুসৃত নতুন পদ্ধতিতে লিথিয়াম নিষ্কাশনের এই বাধা দূরীভূত হতে চলেছে। তাদের লক্ষ্য হলো ফেলে দেওয়া ব্যাটারি থেকে যাতে সরাসরি লিথিয়ামকে আলাদা করে বের করা যায়। এজন্য তারা কাজে লাগাচ্ছেন ডিইএস।

কলকাতায় রুবি হাসপাতালের কাছে থাকেন সোহিনী। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার পর ব্যাঙ্গালোরের জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চ (জেএনসিএএসআর) থেকে মেটিরিয়াল সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করেন সোহিনী। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর হিউস্টনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরাল ফেলো।

ডিইএসকে কাজে লাগিয়ে তৈরি এই নতুন রাসায়নিক পদ্ধতি কীভাবে শুধুমাত্র লিথিয়ামকে বের করে আনতে পারছে? এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সোহিনী বলেন, ডিইএসের সঙ্গে মাইক্রোওয়েভ টেকনোলজি ব্যবহার করে তাঁরা দেখতে পান যে ফেলে দেওয়া লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি থেকে অনেক দ্রুত লিথিয়াম নিষ্কাশন হচ্ছে। এটা অনেকটা মাইক্রোওয়েভে রান্না করার মতো। মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করার সময় সেটা খুব তাড়াতাড়ি হয়, কারণ সরাসরি খাবারের অণু বা মলিকিউলের মধ্যে পৌঁছে যায় তাপশক্তি। সোহিনীদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই নতুন পদ্ধতিতে মিনিট পনেরোর মধ্যে অন্তত ৮৭ শতাংশ লিথিয়াম নিষ্কাশন সম্ভব, যেখানে প্রচলিত অয়েল-বাথ হিটিঙে লিথিয়াম নিষ্কাশন করতে অন্তত ১২ ঘণ্টা সময় লাগছে।

এই প্রসঙ্গে সোহিনী জানান— 'কোবাল্ট, লিথিয়াম এই ধরনের বিরল ধাতুগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে জিও-পলিটিকাল বাধা রয়েছে। লিথিয়াম সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় চিলিতে। আমরা যে পদ্ধতিতে লিথিয়াম নিষ্কাশনের উপায় বের করেছি, সেটি একাধারে পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়কর, তেমনই রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রেও বিশেষভাবে কার্যকর হবে বলে আমাদের আশা। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটেও লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে এই প্রক্রিয়ায় লিথিয়াম নিষ্কাশন করা হলে তা বিশ্ব তো বটেই, ভারতের কাছেও যথেষ্ট কার্যকরী হবে'। সোহিনীর লক্ষ্য আগামী দিনে ভারতে ফিরে দেশকে এনার্জি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে তোলা। অভিনব উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে এনার্জি বা শক্তি ক্ষেত্রে দেশকে শক্তিশালী করে তুলতে সংকল্পবদ্ধ গবেষক সোহিনী ভট্টাচার্য এই প্রজন্মের সব শিক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণার উৎস-স্বরূপ।

নবাঙ্কুর

বন্ধুত্ব

অনেক বছর আগের কথা। একদিন এক চাষি তাঁর বাড়ির উঠোনে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর একমাত্র পুত্র ছুটে আসে এবং বাবকে বলে যে রাস্তার ধারের এক পুকুরে একটি ছেলে ডুবে যাচ্ছে। শুনে চাষি সঙ্গে সঙ্গে সেই পুকুর পাড়ে পৌঁছে দেখেন, তাঁর ছেলের বয়সি একটি ছেলে পুকুরের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। পোশাক পরিচ্ছদ দেখে শহরের কোনা ধনীর ছেলে বলে মনে হচ্ছে। সঙ্গে বেশ কিছু বন্ধু থাকলেও তারা সাঁতার না জানায় পাড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সাহায্যের জন্য কেবল চিৎকার করে চলেছে।

চাষি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটিকে জল থেকে পাড়ে তুলে আনলেন। একটি ছেলের প্রাণ বাঁচাতে পেরে তাঁর মনটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল।

এই ঘটনার ঠিক দুদিন পরে হঠাৎ গ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে একটি বহুমূল্য সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি, গাড়ির সঙ্গে অস্ত্রধারী অশ্বারোহী রক্ষীর দল চাষির বাড়ির সামনে এসে থামল।

এত কিছু দেখে চাষি ভয় পেয়েছিলেন বই কী। এরপর গাড়ি থেকে যে ব্যক্তি নেমে এলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ঐশ্বর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। কিন্তু তাঁর মুখের স্মিতহাসি চাষিকে কিছুটা আশ্বস্ত করল।

সেই অভিজাত ব্যক্তি স্মিতহেসে বললেন, আপনি কি সেই মহানুভব যিনি আমার পুত্রের প্রাণ বাঁচিয়েছেন? চাষি অতি বিনয়ের সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলাতে তিনি গরিব চাষির হাত ধরে অশ্রুসজল চোখে বললেন, আপনার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?

চাষি প্রথমে কিছু নিতে রাজি হলেন না। শেষে অনেক অনুরোধের পর বললেন, দেখুন, আমার এমন সাধ্য নেই যে আমি আমার ছেলেকে কোনো ভালো স্কুলে পাড়াই। তাই আপনি যদি একটা ভালো স্কুলে ওর পড়ার ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

একথা শুনে সেই ভদ্রলোক হেসে বললেন, ঠিক আছে, এই যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আজ থেকেই আপনার ছেলে আমার ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা করবে। আমি আমার বাড়িতে রেখে আপনার ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থ করব।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। চাষির ছেলে আর ধনীর ছেলের বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর হয়েছে। দুজনেই অত্যন্ত মেধাবী। যদিও দুজনের বিষয় ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ধনীর ছেলের আকর্ষণ রাজনীতি আর চাষির ছেলের চিকিৎসা বিজ্ঞান। স্নাতক হবার পর একজন মন দেন অণুজীব নিয়ে গবেষণায়, আর একজন রাজনীতিতে। গবেষক বন্ধুর একটি গবেষণাপত্র যখন চিকিৎসা দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলেছে, তখন আর এক বন্ধুর নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা আকৃষ্ট করেছে ইংল্যান্ডের যুবসমাজকে।

এর মধ্যেই ধনীর পুত্র সেই রাজনীতিবিদ বন্ধু এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলেন। অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তার যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন, তখন সেই চাষিপুত্র গবেষক বন্ধু এগিয়ে এলেন। দিন-রাত এক করে নিজের তৈরি ওষুধে চিকিৎসা করতে থাকেন বন্ধুর। একসময় সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন বন্ধুকে। কারণ, তাঁকে ছাড়া তো আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস লেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এই দুই বন্ধুর পরিচয় হলো, চাষির ছেলে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী পেনিসিলিয়ামের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। আর তাঁর বন্ধুটি হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল।

ছোটো বন্ধুরা, বন্ধুত্বের কোনো শেষ নেই। বন্ধুত্ব ঈশ্বরের এক অমূল্য সৃষ্টি। বন্ধু ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ।

সংগ্রহ ঃ সুনীতি ও শান্তিময় ব্যানার্জী,
মতিঝিল কলোনি, দমদম।

পাহাড়-পর্বত

অযোধ্যা পাহাড়

অযোধ্যা পাহাড় পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত। এটি দলমা পাহাড়ের একটি অংশ এবং পূর্বঘাট পর্বতমালার একটি সম্প্রসারিত অংশ। এই অংশটি ছোটোনাপুর মালভূমির সবচেয়ে নীচু ধাপ। অযোধ্যা পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের নাম চেমটোবুরু। আগে গোরগাবুরুকে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধরা হতো। বাঘমুণ্ডি এই পাহাড়ের নিকটস্থ একটি ব্লককেন্দ্র। জনশ্রুতি, শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসকালে অযোধ্য পাহাড়ে এসেছিলেন। এখানে সীতামাতা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে লক্ষ্মণ তিরের সাহায্যে জল বের করে আনেন। সেই জায়গাটি সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় স্থানীয় জনজাতি সমাজের মানুষরা এখানে পূজা ও মেলায় মেতে ওঠেন।

এসো সংস্কৃত শিখি-৩৬

স্বীকরোতু (নিন/নাও / গ্রহণ করুন)

কাউকে দিতে গেলে বলতে হবে **স্বীকরোতু** (গ্রহণ করুন)। বস্তুটির নাম না বললেও চলবে।

অভ্যাস করি -১

(জলং)স্বীকরোতু। (ফলং) স্বীকরোতু। (স্যূতং)স্বীকরোতু। (পুস্তকং) স্বীকরোতু। (লেখনী) স্বীকরোতু। (পত্রিকা) স্বীকরোতু। (উপনেত্রং) স্বীকরোতু।

প্রয়োগ করি–

কোনো বস্তু দেওয়ার অভিনয় করে বলবো **স্বীকরোতু**।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-

যিনি গ্রহণ করবেন তিনি নেওয়ার পর বলবেন 'ধন্যবাদ:'। যিনি দিয়েছিলেন তিনি বলবেন 'স্বাগতম্'।

ভালো কথা

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবসের দিন সকাল ন'টায় আমাদের পাড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। পতাকা তুললেন বিদিশার ঠাকুমা। তিনিই ভাষণ দিলেন। আজ ঠাকুমার মুখে একটা নতুন কথা শুনলাম। তিনি বললেন, ভারতবর্ষ শুধু দুশো বছর ইংরেজদের কাছে পরাধীন ছিল না, তার আগে আরও আটশো বছর পাঠান-মুঘলদের হাতে পরাধীন ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করতে হয়েছে, তেমনই পাঠান-মুঘলদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়েছে। ভাষণ দিতে দিতে ওনার চোখে জল এসে গিয়েছিল। শেষে 'জনগণমন' জাতীয় সংগীত গাওয়া হলো।

সমীর কুমার মাহান্তি, দশম শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ক টি ল ফ

(২) শী ফ ল ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র ন্তী জ জ য় ত

(২) ব বো রা ল ঘ য়া

১২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) হোমানল (২) সদগুরু

১২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) জনসাধারণ (২) তুষারধবল

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, মালদা। (৩) শুভম সরকার, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (৪) মানসী হালদার, বৈষ্ণবনগর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

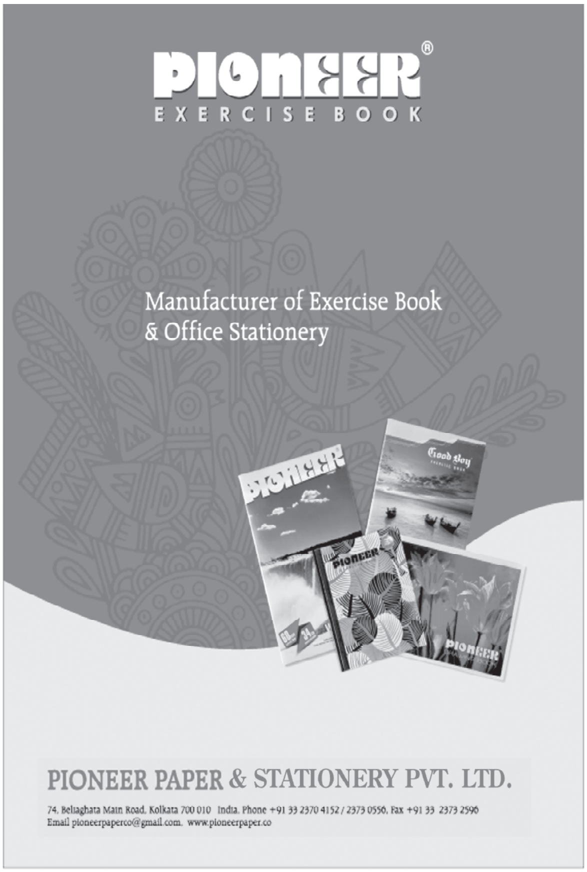

With Best Compliments from -

A

Well wisher

সীতামাতার জন্মস্থল, পশুপতিনাথ এবং গুহ্যেশ্বরীর মন্দির দর্শন

ওম প্রকাশ ঘোষ রায়

জনক রাজার জনকপুর দেখার উদ্দেশ্যে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, মিথিলা রক্সৌল এক্সপ্রেসের টিকিট কিনে নিলাম। যদিও আমরা ঠিক করেছিলাম, প্রথমেই সীতামঢ়ী ও জনক নগরে সীতামাতার জন্মস্থল ও জানকী মন্দির দর্শন করে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থান করে রাক্সৌল হয়ে হাওড়া ফিরে আসব। কিন্তু রেলের টিকিট কিনতে গিয়ে জানতে পারলাম হাওড়া থেকে সীতামঢ়ী যাওয়ার কোনো ট্রেন পাওয়া যায় না। তাই রক্সৌল থেকে দিনে দিনে সীতামঢ়ী গিয়ে জানকপুর থেকে কাঠমাণ্ডু যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেভাবেই আমরা নির্ধারিত দিনে মিথিলা রক্সৌল এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে যাই। হঠাৎ মধ্যরাতে আমাদের মোবাইল ফোনে একটা বার্তা আসে যে আমাদের ট্রেন যে নির্ধারিত রক্সৌল যাওয়ার কথা তা পরিবর্তন হয়ে সীতামঢ়ী হয়ে রক্সৌল যাবে। মেঘ না চাইতে জলের দেখা পেয়ে আমাদের হৃদয় আনন্দে নেচে উঠলো। রাতে আর ঘুম হলো না। ভোর রাত ৪টায় আমরা সীতামঢ়ী পৌঁছে গেলাম।

আমরা তড়িঘড়ি সীতামঢ়ী জংশন স্টেশনে নেমে পড়ি। স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে একটা স্থানীয় চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে জানকী জন্মস্থল মন্দিরে যাবার অটো পেয়েও গেলাম। মাত্র ৩ কিলোমিটার পথ। অবশেষে পৌঁছে গেলাম জানকী মন্দির প্রাঙ্গণে। ছোট্ট ব্যস্ত এক শহরতলির কেন্দ্রস্থলে শ্বেতশুভ্র মন্দিরটি বহুতলবিশিষ্ট দালানের ঘেরাতে অবস্থিত। মন্দিরে রয়েছে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রতিমূর্তি। একজন পূজারিকে দেখলাম দর্শনার্থীদের পূজার নৈবেদ্য ও দক্ষিণা গ্রহণ করে বার বার মন্দিরের পর্দার ভেতরে প্রবেশ করছে আর বের হচ্ছেন। পূজারির হাতে পূজার ডালা আর দক্ষিণা দিতেই পর্দার ফাঁকে এক পলকে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের প্রতিমা দর্শন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপালের জনকপুর ধাম থেকে শুরু হয়ে ভারতের বিহার প্রদেশের সীতামঢ়ী হয়ে বৈদ্যনাথ ধাম পর্যন্ত ছিল সেকালে মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনকের রাজত্ব। জানকী মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি কুণ্ড। এই কুণ্ডস্থলে ছিল রাজর্ষি জনকের কৃষির ক্ষেত্র। তিনি সেখানে লাঙল দিয়ে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করার সময় লাঙলের অগ্রভাগের মাটি থেকে এক কন্যা উঠে এসেছিল। সেই কন্যাই সীতা নামে বিশেষ ভাবে পরিচিতা। মাটি থেকে উঠে এলেও সে জনকরাজেরই কন্যা। রাজা জনকের নামানুসারে সীতার আরেক নাম জানকী। আর কৃষিক্ষেত্র হতে উত্থিতা হয়েছেন বলে সীতাকে কৃষিদেবী রূপে কল্পনা করা হয়। যেহেতু ভূমি থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাই সীতা হলেন ভূমিজা। অবশেষে আমরা জানকী মন্দিরের অনতিদূরে জলাশয়স্থিত কুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থলে ছোট্ট শ্বেতশুভ্র মন্দিরে সীতামাতার নানান মূর্তি-সহ একটি শিশুকন্যার প্রতিমা দর্শন করি। এই সীতামঢ়ীতেই রাজর্ষি জনক সীতাকে নিজের মেয়ের মতো লালনপালন করেন। তারই স্মৃতি স্মরণে এই জানকী মন্দির ও জন্মস্থল মন্দির স্থাপন করা

ফ ঃ ৬

হয়েছে। সীতাদেবীর জন্মস্থলে প্রণতি জানিয়ে আর দেরি না করে লোকাল বাসে ভারত-নেপাল সীমান্তে পৌঁছে গেলাম।

তখন প্রায় সকাল ৯টা। নেপাল বর্তমানে বিদেশ হলেও সমগ্র বিশ্বে এই নেপালই ছিল ভারতের প্রতিবেশী একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র, কিন্তু অতি সম্প্রতি সেখানে চীন ও পাকিস্তানের মদতকারী সমাজতান্ত্রিক নামধারী বামপন্থীদের উত্থানে হিন্দুরাজতন্ত্র স্থিমিত হয়েছিল। তবে বর্তমানে সেখানে হিন্দুরাজ শাসিত হিন্দু রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। এই ছোটো পাহাড়ি জঙ্গলময় হিমালয়ের বুকের দেশটার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গময় সৌহার্দ্য, ভাব বিনিময়ের ঐক্য-সমৃদ্ধ দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কোনো পাশপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয় না। তবে নাগরিকত্বের প্রমাণের জন্য যে কোনো জাতীয়তা সম্পর্কিত সঠিক ও সচিত্র পরিচয়পত্র, আধার কার্ড, প্যানকার্ড, ভোটার কার্ড, পাশপোর্ট যে কোনো একটি থাকলেই অনায়াসে নেপাল পরিভ্রমণ করা যায়। আর ভারতীয়দের জন্য শুধুমাত্র ভারতীয় টাকাও নেপালে প্রচলন রয়েছে অর্থাৎ ভারতীয় ১০০ টাকায় নেপালি ১৬০ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য কোনো ভারতীয় টাকা যেমন ২০০, ৫০০, ১০০০ টাকা নেপালে চলে না। তাই শুধুমাত্র ১০০ টাকার নোটই নেওয়া উচিত।

ভ্রমণার্থীদের নেপালি ভাষা জানা না থাকলেও হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু এমনকী বাংলাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু রয়েছে। আমরা ভিথামোড় বর্ডার হেঁটেই পেরিয়ে নেপালে পা রাখলাম। পথের দু'পাশে পারাপারের জন্য রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। চেকপোস্ট থাকলেও আমাদের কোনো চেক করা হয়নি, অনুরূপভাবে নেপাল থেকেও যারা ভারতে আসছে তাদেরও কোনো চেক করা হচ্ছে না। এই খোলামেলা পরিস্থিতিতে ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক বর্ডার দিয়ে পাকিস্তান-চীন ও বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিরা নাশকতামূলক কাজে অনায়াসে ভারতে আসা যাওয়া করে থাকে। আবার চোরাকারবারীদেরও স্বর্গরাজ্য এই নেপাল। আমরা ভিথামোড় বর্ডার পেরোতে গিয়ে অনেকগুলো অবৈধ মানি চেঞ্জারকে পথের ধারে বসে থাকতে দেখলাম। আমাদের সঙ্গে থাকা ভারতীয় টাকাগুলো ১৬০ টাকা হিসেবে ভাঙিয়ে নিলাম। শুনেছি নেপালে সাধারণ বাজারে ১৬০ টাকা তো দেবেই না। তদুপরি ভারতীয় টাকা দেখলেই ভিনদেশি বলে দোকানিরা জিনিসের দামও বাড়িয়ে দেবে। টাকার হিসেবে ভারতে ১০০ টাকায় ১২০/১৩০ টাকা দেবে। কোনো কোনো হোটেল, রেস্টুরেন্টে ভারতীয় টাকা নেবে না। আমরা বর্ডার পেরিয়ে জানকপুর যাবার অটো পেয়ে গেলাম।

প্রায় বেলা ১১টার সময় অটোওয়ালা জনকপুরের কেন্দ্রস্থলে শ্রীগোপালজী ধর্মশালায় আমাদের পৌঁছে দিল। সেখানে মাথাপিছু ৩০০ টাকা ভাড়ায় ডবল সিটের একটা রুমও পেয়ে গেলাম। স্নানাদি সেরে নিলাম। স্থানীয় হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি জনকরাজার মহলের উদ্দেশে। অপরূপ সৌকর্যমণ্ডিত এই মহলেই রয়েছে নওলকা অর্থাৎ জানকী মন্দির। প্যাগোড়া ধর্মী এই মন্দিরটি ১৮৯৫ সালে মধ্যপ্রদেশের টিকনগড়ের রানি স্বপ্নাদেশ পেয়ে তৈরি করান। এই মন্দিরে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতামাতার প্রতিমূর্তি। আমরা তা দর্শন করে জানকী মহলের পাশের একটি পার্কের মধ্যে কাঁচের ঘেরা হলঘরে রাম-সীতার বিবাহ বাসরে তাঁদের বিবাহের সুসজ্জিত মূর্তিসমূহ দর্শন করি। এই স্থলেই রাম ও সীতার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছিল। সীতামাতা বিবাহযোগ্যা হওয়ায় জননকরাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে রাজপুরুষ বীর্যবত্তা প্রদর্শন করে হরধনুতে জ্যা সংযোজন করতে পারবেন তাঁকেই তিনি তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করবেন। বহু রাজপুত্র এসে সীতামাতাকে পত্নীরূপে লাভ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই হরধনুতে জ্যা সংযোজন দূরে থাক ধনুকটি তুলতেই পারলেন না। তাই সীতামাতার পাণিগ্রহণও করতে পারলেন না। অথচ শ্রীরামচন্দ্র অবলীলায় ধনুকটি উত্তোলন পূর্বক অতি সহজে তাতে জ্যা সংযোজন করেন। আর তাতেই ধনুকটি ভেঙে যায়।

এই হরধনুটির একটি পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে। এটি কোনো সাধারণ ধনু নয়, যা ছিল জনগণের দ্বারা পূজিত একটি শ্রেষ্ঠ ধনু। এই ধনুটি এবং আরও একটি ধনু বিশ্বকর্মা স্বয়ং দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তৈরি করেছিলেন। কোনো একসময় যুদ্ধকালে এই দু'টি ধনুকের একটি মহাদেবকে দান করেছিলেন। মহাদেব তা দিয়ে ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করেন। এটিই হলো শিব বা হরধনু। অপর ধনুকটি দেবতারা বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন। দেবতারা এক সময় ব্রহ্মার অনুমতি সাপেক্ষে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। যার ফলে তাঁদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। একে অপরকে পরাজিত করে জয়ী হবার তীব্র বাসনায় যুদ্ধ লিপ্ত হলেন। কিন্তু হঠাৎ শিবের ভীষণ ধনুকটি শিথিল হয়ে পড়াতে বিষ্ণুর হুংকারে মহাদেব স্তব্ধ হয়ে পড়েন। তখন দেবতারা তাঁদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করে বিষ্ণুকেই অধিক শক্তিশালী বলে মেনে নিলেন। তাই মহাযশস্বী শিবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিদেহ রাজা দেবরাতকে সেই ধনু দান করলেন। ভৃগুবংশীয় ঋচিককে এই ধনুকটি দেবরাত দেন। ঋচিক পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে তা দান করেন। কিন্তু এক যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুন জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পিতার মৃত্যুতে রেগে গিয়ে পরশুরাম বহু ক্ষত্রিয়কে হত্যা করেছিলেন। তারপর পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে যজ্ঞ করে দক্ষিণা রূপে পুণ্যকর্মা কশ্যপকে ধনুকটি দান করেন এবং তিনি মহেন্দ্র পর্বতে বসবাস করতে থাকেন। পরশুরাম হলেন বিশ্বমিত্রের ভগ্নীর পৌত্র।

শ্রীরামচন্দ্র মিথিলা রাজদরবারে সপার্ষদ ভাইদের সঙ্গে নিয়ে হরধনুটিতে জ্যা সংযোজন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই সময়ে পরশুরাম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ধনুভঙ্গের বিস্ময়করণ ঘটনাটি দেখার জন্য হাজার হাজার মিথিলাবাসী, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধচারণ কিন্নর, যক্ষ্ম, রাক্ষস, নাগ উপস্থিত ছিলেন। পরশুরাম স্বয়ং রামচন্দ্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে রাম এই সেই হরধনু যা পিতৃ-পিতামহ ক্রমে আমি পেয়েছি তা তুমি গ্রহণ কর।' অতপর রামচন্দ্র ধনুটি অবলীলাক্রমে তুলে ধরেন। সর্বসমক্ষে অতি সহজে সেই ধনুকটিতে জ্যা যোজনা করেন। সেই সময় ধনুকটির মধ্যভাগ ধরে একেবারে ভেঙেও পড়েন। যেহেতু রাজর্ষি জনক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যিনি হরধনুতে জ্যা সংযোজন করবেন তার হাতেই কন্যা সম্প্রদান করবেন।

শুভ বিবাহের দিন ধার্য হলো। বিবাহপূর্ব যাবতীয় করণীয় কাজ সম্পাদন পূর্বক মঘা নক্ষত্রের পরবর্তী তৃতীয় দিনে উত্তরফাল্গুনী দিবসে রাজকীয় ভাবে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীর বিবাহ কাজ শাস্ত্রসম্মত বিধিমতে সম্পন্ন হলো। শুধু তাই নয়, মিথিলাধিপতি জনকরাজের অপর কন্যা উর্মিলা এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে রামচন্দ্রের অপর দুই ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। ওই বিবাহ অনুষ্ঠানে রাজা দশরথ তাঁর বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ, রাজন্যবর্গ এবং মহর্ষি ও অমাত্যবর্গ, ঋষিমণ্ডলী ও মহাত্মাগণ যেমন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, বীর যুধাজিৎ এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রঘুবংশীয় শ্রেষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্র-সহ অপর তিন ভাইদের বিবাহ সম্পন্ন হবার সময় স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে আর অপ্সরারা স্বর্গে নৃত্য করতে থাকে, গন্ধর্বেরা মধুর সংগীত গাইতে থাকেন।

আমরা যখন শ্রীরামচন্দ্র ও সীতামাতার বিবাহ স্থল থেকে বেরিয়ে আসি তখন প্রায় ২টো বাজে। সেখানেই লোকমুখে শুনেছিলাম হরধনুর একটা অংশ আজও রয়ে গেছে বিবাহবাসর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে ধনুষাধাম গ্রামে। বাসেও যাওয়া যায়। তবে আমরা তিনজন অন্য যাত্রী-সহ ধনুষাধামে যাওয়ার অটো পেয়ে গেলাম। যা আবার ফিরিয়েও নিয়ে আসবে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধনুষাধামে পৌঁছে গেলাম। যদিও সড়ক পথটা ভালোই কিন্তু ধূলিধূসরিত। আর তার দু'পাশের জনবসতি দেখতে অনেকটা বিহারের মতোই। হরধনুর ভগ্নাংশের একটা টুকরো এই মন্দিরে রয়েছে। বিশাল ছাউনি ঘেরা খোলামেলা হলঘরের ভেতরে রেলিং দেওয়া দীর্ঘ অংশের মধ্যস্থলে একটা জলভর্তি গর্ত রয়েছে। সেখানেই হরধনুর টুকরোটা রয়েছে। পুণ্যার্থীরা প্রণাম করে সেই জল নিয়ে মাথায় দিচ্ছে। আমরা কোনো ধনুকের অংশ বিশেষ দেখতে পেলাম না, কেননা রেলিংঘেরা জায়গাটা ফুল আর ফুলের মালায় একেবারে ভর্তি রয়েছে। পুণ্যার্থীরা ফুলেরমালা সেখানে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সেই স্থলে একটা ত্রিশূলও প্রোথিত রয়েছে। আমরাও ফুলের স্তবক দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে আসি ধনুষাধাম থেকে।

আর দেরি না করে ফিরে আসি জানকী মহলের অনতি দূরে একটি বিশাল জলাশয়ের কাছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এই জলাশয়টিকে বলা হয় গঙ্গাসাগর সরোবর। সীতাদেবী বিবাহের দিনের আগে এই সরোবরে স্নান করেছিলেন। তাই এটিও একটি পুণ্য স্থল। আমরা দেখলাম সেই জলাশয়ের এক পাশে রয়েছে ফুল আর প্রদীপ দিয়ে সুসজ্জিত মঞ্চ এবং অন্য দুই পাশে দর্শনার্থী বসার জন্য সুব্যবস্থা। ধীরে ধীরে জনসমাগমে মুখরিত হয়ে উঠে। আমরাও গিয়ে বসে পাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে সান্ধ্য আরতি। ঠিক যেমনটি হয় দশাশ্বমেধ ঘাটে এবং হর কি পৌড়ির ঘাটে। কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে ধুপধুনো জ্বালিয়ে সান্ধ্য আরতি উপভোগ করলাম।

রাত প্রায় ৯টার দিকে স্থানীয় একটা হোটেলে আহারাদি সেরে ধর্মশালায় ফিরে আসি। পরদিন সকালে জানকীপুর বাস

স্ট্যান্ডে গিয়ে কাঠমাণ্ডু যাওয়ার বাস পেয়ে গেলাম। ভাড়া ১০০০ টাকা। প্রায় বিকেল সাড়ে চারটায় কাঠমাণ্ডু পৌঁছলাম। নেপালের রাজধানী শহর কাঠমাণ্ডু। এই শহরের নামকরণেরও একটা ইতিহাস রয়েছে। যোড়শ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মীনর সিংহ মল্ল কর্তৃক সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি রাজপ্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল একটি গাছের কাঠ থেকে। সম্ভবত 'কাঠের মণ্ডপ' নাম থেকেই রাজধানীর নামকরণ হয়েছে কাঠমাণ্ডু। শহরের কেন্দ্রস্থল বাসস্ট্যান্ড থেকে অটোয় পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছাকাছি গোশালা ধর্মশালায় মাথাপিছু প্রতিদিন ৩০০ টাকা হিসেবে দু'জনের জন্য একটা রুমও পেয়ে গেলাম। সারাদিনের বাস জার্নিতে ক্লান্ত ছিলাম। রাতটুকু এক ঘুমে কাটিয়ে পরদিন ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিয়ে ধর্মশালার অনতিদূরে অবস্থিত কাঠমাণ্ডুর অন্যতম তীর্থস্থান পশুপতিনাথের মন্দিরে পৌঁছলাম। এই প্রাচীন শিব মন্দিরটির পাশ দিয়ে বাগমতি নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই ভোরবেলা থেকেই পূজা দেওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের লম্বা লাইন পড়ে গেছে। আমরাও পূজার নৈবেদ্য কিনে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি।

এই প্যাগোডাধর্মী মন্দিরটি প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরাতন। মন্দিরের সামনে রয়েছে বিশালাকার একটি রুপোর নির্মিত ষাঁড়। মন্দিরের গম্বুজটি সোনার তৈরি। প্রতিটি দরজা রুপোর কারুকার্য করা। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মন্দিরে পূজা দিয়ে শিবলিঙ্গ দর্শন করে পূজারির কাছ থেকে আশীর্বাদী ফুল ও প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে আসি।

এরপর বাগমতি নদী পেরিয়ে পাহাড়ের উপরে ছোটো-বড়ো অনেকগুলো মন্দির দর্শন করি। যেখানে প্রতিটি মন্দিরে সাধুসন্ত ধ্যানে মগ্ন রয়েছে দেখতে পেলাম। সারা এলাকা জুড়ে বানরের উপস্থিতি থাকলেও কোনো উৎপাত করতে দেখলাম না। পুণ্যার্থীরা ফলমূল খেতে দিচ্ছে। বানরগুলো নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। অবশেষে মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে আসার পথে কোনো এক গোষ্ঠীর সাধুমণ্ডলীর শ্রীরাম কথা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে পুণ্যার্থীদের থালাভর্তি দুধের পায়েস আর মিষ্টি বিতরণ করতে দেখে আমরাও তাই গ্রহণ করলাম। আর কিছুটাপথ এগোতেই অন্য এক গোষ্ঠীর দেওয়া বাটিভর্তি চিড়ে আর দই খেতে দেওয়া হলো। পশুপতিনাথের মন্দিরের কিছুটা দূরত্বে সরু একটা খালের উপরকার সেতু পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম গুহ্যেশ্বরী মায়ের মন্দিরে।

কথিত, এটি ৫১টি মাতৃপীঠের অন্যতম পীঠ এই স্থলে পতিত হয়েছিল সতীমায়ের জঙ্ঘা। ফিরতি পথে এক টিলার উপরে মায়ের ভৈরব কপালীর মন্দির মাতৃপীঠ আর ভৈরবের মন্দিরে পূজা দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে গোশালার মোড়ে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় ১২টা। এক দোকানির কথামতো গোশালার মোড়েই শহরতলি বাস পেয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই শিবপুরী পাহাড়ের পাদদেশে বুড়ানীল কণ্ঠ মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট একটি জলাশয়ের একপ্রান্তে লাল শামিয়ানার নীচে কালোপাথরের নির্মিত ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শায়িত রয়েছেন। ভগবান বিষ্ণুকে ঘিরে জলাশয়ের উপরে শত শত পায়রা ভক্তদের দেওয়া দানা খেয়ে চলেছে। শ্রীবিষ্ণুর পদপ্রান্তে প্রণতি জানিয়ে ফিরে চলি এবং মন্দিরের অনতিদূরে একটু অপেক্ষা করতেই শহরতলির বাস স্টপেজে বৌধনাথ স্তুপে যাওয়ার বাসও পেয়ে গেলাম। এখান থেকে পূর্বদিকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে এই বৌধনাথ স্তূপটি অবস্থিত।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্তূপটির উচ্চতা প্রায় ১২৭ ফুট। গম্বুজাকৃতি স্তূপটির চারিদিকে ১০০৮টি ধর্মচক্র রয়েছে। এর চূড়োতে বুদ্ধদেবের ত্রিনয়ন অঙ্কিত রয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে লিচ্ছবিরাজ মানদেব এটি নির্মাণ করেছিলেন। আমরা সেখানে আর বেশি সময় না কাটিয়ে অটোয় আরও কয়েকজন দর্শনার্থী-সহ স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ি। পাহাড়ি টিলার উপর রয়েছে বিরাট এক বৌদ্ধ চৈত্য। অনেকগুলো সিড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। সেও এক কষ্টকর অবস্থা। ওঠার পথে মাঝে মাঝে সিঁড়ির পাশে বেশ কটি রঙিন বুদ্ধমূর্তি রয়েছে দেখতে পেলাম। টিলার শেষ প্রান্ত চূড়োতে সোনালি রঙের চৈত্যে বুদ্ধদেবের চোখ অঙ্কিত রয়েছে। তবে যেটা দর্শনীয় তা হলো এই টিলার চূড়ো থেকে কাঠমাণ্ডু শহরের অপরূপ দৃশ্য যেন মনে হবে একটি পোস্টার চিত্র ঝুলে রয়েছে। আমরা যখন স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে টিলা থেকে নেমে এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়।

পরদিন সকালে আমরা শহরতলির বাসে থামেল এরিয়া পৌঁছলাম তারপর হেঁটেই ত্রিদেবীর মন্দিরে দক্ষিণা কালী, জ্বালামাঈ ও কামাখ্যা মায়ের দর্শন করি। আরও তিনজন দর্শনার্থী-সহ অটোতে নেপাল রাজার পুরাতন বাসভবন হনুমান ধোকায় পৌঁছলাম। এই রাজপ্রাসাদটি বর্তমানে মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে কয়েকটা দেব-দেবীর মন্দির যেমন শিবপার্বতী, কালভৈরব, গণেশ, জগন্নাথদেব, ও হনুমানের মন্দির রয়েছে। এই রাজভবনটির দ্বাররক্ষী হলো হনুমান, যে কারণে একে হনুমান ধোকা বলা হয়ে থাকে। এরপর কুমারী মন্দির দর্শন করি। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন মল্লরাজ জয় প্রকাশ মল্ল। মন্দিরে তিন থেকে নয় বছর বয়েসি বালিকাকে মনোনীত করে কুমারীদেবী হিসেবে পূজিতা হয়ে থাকেন। যদিও সব সময় দেবীর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা ভাগ্যবান যে সেই কুমারীদেবীর দর্শন পেয়েছিলাম। কোনো এক পার্বণ উপলক্ষ্যে সেদিন মধ্যাহ্নে দেবীর পূজা ও আরতি চলছিল। এই কুমারীদেবীকে দেবী দুর্গার অবতার হিসেবে কল্পনা করে থাকেন নেপালিরা। আমরা দেবী কুমারীর মন্দির থেকে বেরিয়ে স্থানীয় একটা হোটেলে খাওয়া দাওয়া শেষে সেখান থেকেই ভক্তপুর যাওয়ার বাস পেয়ে গেলাম। কাঠমাণ্ডু শহর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই প্রাচীন শহরটি। এই ছোট্ট শহরটির প্রায় বাড়িঘর কাঠের তৈরি। এখানে রয়েছে রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের তৈরি ৫৫টি জানালা বিশিষ্ট কারুকার্য খচিত রাজপ্রাসাদ। তাছাড়াও রয়েছে লায়ন গেট, ছবির গ্যালারি, ভৈরবনাথ মন্দির, সূর্য বিনায়ক মন্দির, লয়াটোপলা মন্দির ইত্যাদি। আমরা আর বেশি দেরি না করে শহরতলির বাসে ধর্মশালায় ফিরে আসি।

ধর্মশালার কাছেই গোল্ডেন ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে সেদিনই সন্ধ্যা ৬টার বাসে বীরগঞ্জ রওনা হই। ভোর রাতে ৫টায় পৌঁছে গিয়ে হেঁটে বর্ডার পেরিয়ে রাক্সৌল থেকে ট্রেনে হাওড়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই।

আরজি করের ঘটনায় শিক্ষক সংগঠনের অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতীয় সংস্কৃতির চিরাচরিত প্রথাকে সামনে রেখে রাখিবন্ধনের মাধ্যমে আরজি কর হাসপাতালের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক অভিনভ প্রতিবাদ জানাল শিক্ষক সংগঠন 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ'। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাখি সুরক্ষার প্রতীক, তাই এই ভাবনাকে সামনে রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে ডাক্তার-সহ সমাজের সর্বস্তরের কর্মচারীদের সুরক্ষার আবেদন জানিয়ে, রাজ্যের সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করতে রাখি পূর্ণিমার পবিত্র দিনে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি, পশ্চিমবঙ্গে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষক সমাজ, ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে ডাক্তার-সহ সমস্ত কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার ও হত্যালীলা সংঘঠিত হচ্ছে। এই নিপীড়ন ও মৃত্যু মিছিলের বিভীষিকা, যা আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আমরা মনে করি পুলিশ প্রশাসন যদি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে, তাহলে এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যা আমরা পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি না। আরজি কর কাণ্ডের ঘটনা উল্লেখ করে অতীতে শিক্ষাঙ্গনে ঘটে যাওয়ার বেশ কিছু ঘটনার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'আমরা দেখেছি, এর আগে রায়গঞ্জ কলেজে, রামপুরহাট কলেজের অধ্যক্ষদের ওপর বহিরাগতদের আক্রমণের ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এছাড়াও ঝাড়গ্রাম কলেজ, ভাঙড় কলেজের অধ্যাপকদেরও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।'

সংগঠনের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলেন, 'রাখিবন্ধন সুরক্ষার প্রতীক'। ভারতীয় ইতিহাসে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে রাখিবন্ধন কার্যক্রমের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

তাই পুলিশমন্ত্রী এবং প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মীদের কাছে আমরা আমাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে রাখিবন্ধনের মতো কার্যক্রমকে বেছে নিয়েছি। রাজ্যজুড়ে প্রায় দেড়শো বেশি থানাতে রাখিবন্ধন কর্মসূচী পালন করেছি। সেই সঙ্গে সংগঠনের প্রত্যেক জেলা থেকে পুলিশমন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখি পাঠানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'যদি এতেও পুলিশ-প্রশাসনের হুঁশ না ফেরে তাহলে আগামী দিনে আমরা বড়ো আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।

আগামী ২০৩৬ সালের মধ্যে ভারতে আনুপাতিক হারে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগামী ১২ বছরের মধ্যে দেশে পুরুষদের অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রকের রিপোর্টে অন্তত এমনটাই দাবি করা হয়েছে। নারী-পুরুষের অনুপাত ৯৪৩ থেকে ৯৫২ হতে পারে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০১১ সালে যেখানে প্রতি হাজার জন পুরুষের তুলনায় মহিলা সংখ্যা ছিল ৯৪৩ জন সেখানে ২০৩৬ সালে বেড়ে হবে প্রতি হাজার জন পিছু ৯৫২ জন। 'উইমেন অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়া, ২০২৩' শীর্ষক একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১১ সালের তুলনায় ২০৩৫ সালে দেশের জন সংখ্যায় ১৫ বছরের কম বয়সিদের সংখ্যার অনুপাত কমবে। জন্ম হার কমে যাওয়াই এর মূল কারণ হিসাবে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে। অন্যদিকে বাড়তে পারে ৬০ বা তার বেশি বয়সের মানুষের সংখ্যা।

জনগণনার নিরিখে ইতিমধ্যেই চীনকে টপকে গিয়েছে ভারত। আর ১২ বছরের মধ্যেই ভারতের জনসংখ্যা দেড়শো কোটির গণ্ডি টপকে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০৩৬ সালে ভারতের জনসংখ্যা বেড়ে হবে ১৫২ কোটি ২০ লক্ষ। পাশাপাশি বাড়বে মহিলাদের সংখ্যা। গ্রাম ও শহরে নারী-পুরুষের মধ্যে অনুপাতের তারতম্য বিষয়টিও ধরা পড়েছে এই রিপোর্টে। যে কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক-সহ ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের উপস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ নিয়ে এই রিপোর্টে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে।

আখাউড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাখিবন্ধন উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশ জুড়ে চলছে প্রবল রাজনৈতিক গোলযোগ। বহু মানুষের মৃত্যুর সাক্ষী থেকেছে এই প্রতিবেশী দেশ। রাজনৈতিক পালাবদলের এই অস্থির সময়ে সংখ্যালঘু মানুষরা সেই দেশে নানা ভাবে নির্যাতনের শিকার। এই প্রবল ভূ-রাজনৈতিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নতি সাধন এবং দুই দেশের মৈত্রীর বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ত্রিপুরা (পশ্চিম) লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ থাকার পাশাপাশি ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন প্রতিমা ভৌমিক।

গত ১৯ আগস্ট রাখিপূর্ণিমার দিনে বিকেল পাঁচটায় আগরতলা-স্থিত আখাউড়া সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সদস্যদের রাখিবন্ধন করেন। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী হলো বিজিবি। রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে আখাউড়া আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান দুই দেশের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে রক্ষা ও মজবুত করবে বলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই দেশের প্রতিনিধিরা আশাপ্রকাশ করেন। সীমান্তে এই আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বিজিবি-র আধিকারিকরা এই রাখিবন্ধনে সমাদৃত ও আপ্লুত বোধ করেন। বিরল এই মুহূর্তটি ছিল সত্যিই প্রাণবন্ত। প্রতিমা ভৌমিক সে সময় বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে এসেছেন তাদেরকেও রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর আধিকারিক ও জওয়ানদের হাতেও রাখিবন্ধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী। উপস্থিত বিজিবি-র প্রতিনিধি মোহাম্মদ শিশির ও আনোয়ারুল উভয় দেশের সম্পর্ককে চলমান ও অটুট রাখার ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করেন। এদিন আমদানি- রপ্তানিতে যুক্ত পণ্য পরিবাহী গাড়ির চালকদেরও প্রাক্তন মন্ত্রী রাখি পরিয়ে দেন।

কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গি হামলা মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৫ জুলাই জম্মু-কাশ্মীরের ডোডা জেলায় ভারতীয় সেনা ও পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের মধ্যে হওয়া একটি সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন-সহ চার জন জওয়ান প্রাণ হারান। ডোডায় ভারতীয় সেনার ওপরে হামলায় যুক্ত এই জঙ্গিরা কিস্তওয়ার জেলা পেরিয়ে অনন্তনাগ জেলায় প্রবেশ করে। কিস্তওয়ার রেঞ্জ পেরিয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের কাপরান এলাকায় ঢুকে যাওয়া এই জঙ্গিদের উপস্থিতি ট্র্যাক করে জঙ্গি দমনের উদ্দেশ্যে গত ৯ ও ১০ আগস্ট রাতে গভীর অরণ্য অধ্যুষিত পূর্ব কাপরান এলাকায় অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস্ ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। ১০ হাজার ফুট উচ্চতায়, পার্বত্য অঞ্চলে, নদী-নালা অধ্যুষিত ঘন জঙ্গলে জঙ্গি দমনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর এই কর্ডনিং ও সার্চ অপারেশন ছিল বেশ কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। গত ১০ আগস্ট অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ অঞ্চলে আহলান গগরমাণ্ডু জঙ্গলে দুপুর দুটোয় জঙ্গিদের গতিবিধি নজরে আসতেই তৎপর হয় সেনাবাহিনী, প্যারা কম্যান্ডো ও স্থানীয় পুলিশ। তখনই সেনার ওপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালায় জঙ্গিরা। সেনাদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসবাদীরা এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। গুলিতে ছয়জন সেনা জওয়ান ও দু'জন স্থানীয় নাগরিক আহত হন। আহত ছয়জন জওয়ানের মধ্যে দু'জন জওয়ান প্রাণ হারান। নিহতরা হলেন— হাবিলদার দীপক কুমার যাদব এবং ল্যান্স নায়েক প্রবীণ শর্মা। গত ১১ আগস্ট হাসপাতালে আহত একজন স্থানীয় নাগরিক আবদুল রশিদ দারের মৃত্যু হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এই কোকেরনাগ অঞ্চলেই সংঘটিত একটি জঙ্গি হামলায় কর্নেল মনপ্রীত সিংহ, মেজর আশিস, ডেপুটি পুলিশ সুপার হুমায়ুন ভাট-সহ চারজন নিরাপত্তা আধিকারিক প্রাণ হারান। লস্কর-ই-তৈবার একজন সিনিয়র কমান্ডার-সহ দুই পাক জঙ্গিকে সেই ঘটনায় খতম করে নিরাপত্তা বাহিনী। গত ১০ আগস্ট কোকেরনাগে এই হামলার পর জঙ্গিদের সন্ধানে পুরো এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি জারি রয়েছে বলে সেনার তরফে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়িতে সিংহ জুটির নাম বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'আকবর' ও 'সীতা'-র পরিবর্তে 'সূরজ' ও 'তনয়া'। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কের সিংহ ও সিংহীর নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে শিলিগুড়ি সাফারি পার্কে নিয়ে আসা হয়েছিল ওই সিংহ-সিংহীকে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সিংহ দুটির নাম নিয়ে হিন্দু সংগঠনগুলি বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টরকে স্মারকলিপি দেয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী— ত্রিপুরার চিড়িয়াখানা থেকে পাঠানোর সময় 'আইএল২৫', 'আইএল২৬' হিসেবে দুটি পশুকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পশু দুটির এই নামকরণের বিষয়ে আপত্তি তুলে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই মামলায় জোড়া হয়েছিল

রাজ্য বন দপ্তর এবং শিলিগুড়ি সাফারি পার্কের ডিরেক্টরকে। গত ১ আগস্ট রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী জানান যে এই পশুদের নামকরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছে এই অভিযোগ মিথ্যা। ত্রিপুরা সরকার এই দুটি সিংহের নামকরণ করেছিল বলে তিনি পালটা দাবি করেন। অভিযোগ অস্বীকার করেন সাফারি পার্কের ডিরেক্টর কমল সরকার ও রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী।

২০১৬ সালে সিংহটির জন্ম হয় সিপাহিজলায়। সিংহীর জন্ম হয় ২০১৮ সালে ত্রিপুরা চিড়িয়াখানায়। তাদের নামকরণ নিয়ে মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সিংহ-জুটির নামবদলের পরামর্শ দেয়। সিংহ-সিংহীর বিতর্কিত নাম নিয়ে শোরগোল ওঠাতে ত্রিপুরার মুখ্য বন সংরক্ষণবিদ (বন্যপ্রাণ ও পর্যটন) প্রবীণলাল আগরওয়ালকে সাসপেন্ড করে ত্রিপুরা সরকার। গোটা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসলের বক্তব্য— 'ত্রিপুরা রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে ওখানে সিংহের কোনো নামকরণই হয়নি। বেঙ্গল সাফারি চিঠি দিয়ে বলছে তারা কোনো নাম দেয়নি। তবে এই নামকরণটা করলো কে? এইভাবে হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে'।

কানাডা পার্লামেন্টের সদস্য চন্দ্রকান্ত আর্যকে হুমকি খালিস্তানি জঙ্গি পান্নুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'ভারতে ফিরে যান'। কানাডা পার্লামেন্টে নির্বাচিত ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংসদ চন্দ্রকান্ত আর্যকে এই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল নিষিদ্ধ খালিস্তানপন্থী সংগঠন 'শিখস্ ফর জাস্টিস' (এসএফজে)-এর. জঙ্গিনেতা গুরপতবন্ত সিংহ পান্নুনের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কানাডায় একের পর এক হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন কানাডা পার্লামেন্টের সদস্য চন্দ্রকান্ত আর্য। তারপরেই এই হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

গত ২৪ জুলাই চন্দ্রকান্ত আর্য জানান— 'গত কয়েক বছরে, গ্রেটার টরন্টো এরিয়া, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ও কানাডার অন্যান্য স্থানে হিন্দু মন্দিরগুলিতে হামলা হয়েছে। চলতি সপ্তাহে এডমন্টনে স্বামীনারায়ণ মন্দিরে হামলা হয়। তার প্রতিবাদ জানানোর পরেই আমাকে এবং আমার হিন্দু অনুগামীদের কানাডা ছেড়ে ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্য ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়েছে পান্নুন'। খালিস্তানি কট্টরপন্থীরা কানাডার বিভিন্ন অংশে ভারত-বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন-সহ কয়েকটি দেশে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এসএফজে চায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেপঞ্জাবকে একটি স্বাধীন দেশ বানাতে। এই ষড়যন্ত্রে তাদের পিছনে রয়েছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের মদত। ২০১৯ সালের ১০ জুলাই পান্নুনের এই সংগঠনকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেন্দ্র জানিয়েছিল যে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার পক্ষে বড়োসড়ো বিপদ হলো এই সংগঠন। সেই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষের ঠিক আগেই গত ৯ জুলাই আরও পাঁচ বছরের জন্য তা বাড়ানো হয়েছে। তারপরেই নতুন করে কানাডায় ভারত-বিরোধী তৎপরতা বাড়িয়েছে এসএফজে।

পঞ্জাবে পান্নুনের বিরুদ্ধে প্রায় দু'ডজন ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি দেশদ্রোহিতার। এসএফজের বিরুদ্ধে কানাডার পাশাপাশি, আমেরিকা ও ব্রিটেনে ভারতীয় দূতাবাসে হামলার অভিযোগ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও তাদের দৌরাত্ম্যের ঘটনা সামনে এসেছে।

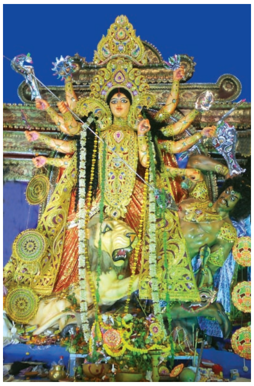

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩১

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা